কালজয়ী আদর্শ ইসলাম

সাইয়েদ কুতুব
অধ্যাপক নাজির আহমদ
অনূদিত

পরিবেশক
পলাশ পাবলিকেশন্স
১০, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

কালজয়ী আদর্শ ইসলাম ॥ প্রকাশনায়ঃ মুহাম্মদ মতিউর রহমান, নও বেলাল প্রকাশনী, ২৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা—১ ॥ মুদ্রণেঃ ওয়াহিদুর রহমান, বর্ণালিপি মুদ্রায়ণ, ১৭ কে, জি, গুপ্ত লেন, ঢাকা-১ ॥ প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ইং ॥ দামঃ তিন টাকা ত্রিশ পয়সা মাত্র ॥

"Kalojoyee Adarsha Islam." Translation of "This Religion of Islam" by Sayyed Qutb, Translated by Prof. Nazir Ahmed, Published by Md. Motiur Rahman Nau Belal Prokashani, DACCA. Price : Taka Three & Paisa Thirty only.

প্রকাশকের কথা

আরব জাহান তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুবের বৈপ্লবিক গ্রন্থ "হাজা দ্বীন"-এর বাংলা অনুবাদ "কালজয়ী আদর্শ ইসলাম" নামে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হলো। বইখানি ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন সুসাহিত্যিক অধ্যাপক নাজির আহমদ।

আমাদের বিশ্বাস বইখানি বাংলাদেশের পাঠক সমাজে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করতে সক্ষম হবে।

ঢাকা, ডিসেম্বর,
১৯৭৫ ইং

মুহাম্মদ মতিউর রহমান
নওবেলাল প্রকাশনী-ঢাকা

বিষয় সূচী

মানব জাতির জন্য একটি পথ

আজ ইসলাম ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি হয় বিস্মৃত নয় তো ভুল উপলব্ধির শিকার। এ বিস্মৃতি অথবা ভুল উপলব্ধি থেকে এর মৌলিক প্রকৃতি, ঐতিহাসিক সত্যতা, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে সৃষ্টি হয় অনেক বিভ্রান্তি।

অবতীর্ণ জীবন বিধান হওয়ার কারণে কেউ কেউ আশা করেন ইসলাম মানব জীবনে অসাধারণ ও অলৌকিক কোন পন্থায় বাস্তবায়িত হবে। তাঁদের এ আশা মানব-প্রকৃতি, মানুষের শক্তি-সামর্থ্য ও বস্তুগত বাস্তবতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন। অবশ্য তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, এ নিয়মে ইসলাম বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে না। বস্তুগত বাস্তবতা এবং মানব-প্রকৃতি এর মোকাবিলা করছে। কোন কোন সময় এ দু'টো জিনিস দ্বীন দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়। আবার কোন কোন সময় এগুলো ঈমানের বিপরীত দিকে চলে মানুষের প্রবৃত্তি ও দুর্বলতাকে চাংগা করে তোলে। ঈমানের ডাকে সাড়া দিতে মানুষকে বাধা দেয়। ঈমানের পথে এগুতে মানুষকে করে নিরুৎসাহিত।

এ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ অনভিপ্রেত হতাশায় নিপতিত হয় এবং দ্বীন-ভিত্তিক জীবনযাত্রার সম্ভাব্যতার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এমনকি দ্বীন সম্পর্কেও তাদের মনে একটা সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায়। এথেকে বুঝা গেল, একটা মৌলিক ভুল থেকেই ভুলের একটা প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আর সে ভুলটি হলো ইসলামকে এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতিকে সঠিকভাবে না বুঝা অথবা এ সোজা ও মৌলিক সত্যটিকে উপেক্ষা করা।

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। মানবজীবনে এর বাস্তবায়ন মানুষের চেষ্টা-সাধনা, তার শক্তি-সামর্থ্যের পরিমাণ এবং বিশেষ পরিবেশে বস্তুগত বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনীয় উপাদান পেলে মানুষ তার ঈপ্সিত লক্ষ্যের জন্য কাজ শুরু করে এবং তার শক্তি সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত কাজ করতে থাকে।

ইসলামের একটা বৈশিষ্ট্য হলো: সে এক মুহূর্তের জন্যও কোন কালে কোন স্থানে মানব-প্রকৃতির, শক্তি-সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতাকে ভুলে যায় না। সে ভুলে যায় না মানব-অস্তিত্বের বস্তুগত বাস্তবতাকে। ইসলাম মানুষকে দিয়ে এক উচ্চ ও মহান লক্ষ্য অর্জিত করাতে চায়, যা মানব রচিত কোন ব্যবস্থা অনুসরণ করে অর্জন করা সম্ভব নয়। আর তা অর্জিত হয়ও। অর্জিত হয় অতি সহজে ও স্বচ্ছন্দে।

বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় ইসলামকে ভুল বুঝা, এর মেজাজ না বুঝা, অলৌকিক ঘটনার প্রত্যাশা, অসাধারণ প্রক্রিয়ায় মানব-প্রকৃতি পরিবর্তনের বাসনা, শক্তি-সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার প্রতি উদাসীনতা এবং বস্তুগত বাস্তবতার প্রতি সচেতনতার অভাব থেকে। ইসলাম কি আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ হয়নি? আল্লাহ কি সর্বশক্তিমান নন? তাহলে কেন ইসলাম মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের গণ্ডীতে ঘূর্ণায়মান? কেন এর কার্যকারিতা মানবিক দুর্বলতা দ্বারা প্রভাবিত হবে? কেন ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীরা সর্বদা বিজয়ী থাকবেনা? কেন তার পবিত্রতা প্রবৃত্তি ও বস্তুগত বাস্তবতা দ্বারা পরাভূত হবে? কেন অন্যায়কারীরা ইসলামের অনুসারীদের ওপর বিজয়ী হবে? এ সব প্রশ্ন ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ইসলামের প্রকৃত রূপ ও প্রয়োগ পদ্ধতি ভালোভাবে না বুঝার কারণেই সৃষ্টি হয়।

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানব-প্রকৃতিকে ইসলাম দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে পরিবর্তিত করে দেবার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তিনি মানুষকে তার বর্তমান প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করাই ভালো মনে করেছেন। তিনি স্বর্গীয় হেদায়াতকে মানুষের সাধনার ফল হিসেবে রেখেছেন। "যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে, তাদেরকে আমি পথ দেখাই।" তিনি মানব-প্রকৃতিকে সদা-ক্রিয়াশীল রূপে সৃষ্টি করেছেন। সে কখনো নিষ্ক্রিয় হয় না। "মানব প্রকৃতির এবং সে সত্তার শপথ যিনি একে সুবিন্যস্ত করেছেন। পরে পাপ ও তাকওয়ার জ্ঞান

তার প্রতি ইলহাম করেছেন। নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেলো সে, যে নিজের নফ-সের পবিত্রতা বিধান করলো এবং ব্যর্থ হলো সে, যে একে পথভ্রষ্ট করলো।"

আল্লাহ চান মানব জাতির জন্য প্রদত্ত জীবন বিধান মানুষের চেষ্টা-সাধনার বলে মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের পরিসীমায় বাস্তবায়িত হোক। "নিশ্চ-য়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে যা আছে তা পরিবর্তিত করে।" "যদি আল্লাহ একদল লোক দিয়ে আরেক দলকে না দমাতেন, পৃথিবী ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো।" আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্যের সে স্তর পর্যন্ত পৌঁছান যে স্তরে পৌঁছার উপযুক্ত চেষ্টা-সাধনা সে করে এবং যে পরিমাণ শক্তি-সামর্থ্য সে প্রয়োগ করে। নিজের জীবন ও সমাজ জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে বাধা-বিপত্তির মোকাবিলায় যে পরিমাণ ধৈর্য্য সে অবলম্বন করে তার সাফল্য অর্জনের পরিমাণ সেরূপই হয়। "মানুষ কি মনে করে যে, তারা বলবে আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছিল যেন ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী আল্লাহ তা জানতে পারেন।"

সৃষ্টি জগতে এমন কেউ নেই যে জিজ্ঞেস করতে পারে, কেন আল্লাহ এমন করতে চাইলেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কারো এ অধিকার নেই যে সৃষ্টির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা—যে ব্যবস্থাপনার সুফল সব সৃষ্টির প্রকৃতিতে বর্তমান—সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। 'কেন ?' এ প্রশ্নটি উন্নতমানের কোন মুমিন বা বড় রকমের কোন নাস্তিক জিজ্ঞেস করে না। মুমিন তো আল্লার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত। তাঁর প্রতি সে বিনীত। মানুষের চিন্তা-শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সে অবহিত। এ সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তি গোটা বিশ্ব জাহানে ক্রিয়াশীল হওয়ার ক্ষমতা রাখে না। এগুলো মুমিন ভালোভাবেই জানে। অপর দিকে, নাস্তিক তো আল্লার অস্তিত্বই স্বীকার করে না। বিশ্বাসী হলে তো আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব এবং সে শ্রেষ্ঠত্বের তাৎপর্য তার মনে দিবা-লোকের মতো মনে হতো। "তিনি যা করেন সে ব্যাপারে কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।" 'কেন ?' এ প্রশ্নটা তারাই করে যারা

নিষ্ঠাবান মুমিনও নয়, আবার কট্টর নাস্তিকও নয়। কাজেই এ নিয়ে খুব বেশী মাথা না ঘামালেও চলে। বিষয়টাকে খুব সিরিয়াসভাবে গ্রহণ না করলেও চলে। যারা আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী নয় তাদের মনে জাগে নানা প্রশ্ন। এমন লোকদের প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হলে আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর ধারণা পরিষ্কারভাবে তাদের সামনে বিবৃত করতে হবে। ফলে স্বচ্ছজ্ঞানের অধিকারী হয়ে তারা সত্যিকারের মুমিন হবে। তা না হলে নাস্তিকতা অবলম্বন করে ভিন্ন পক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। এ প্রশ্নের সমাধান এভাবেই হতে পারে। মত-পার্থক্যের ইতি হতে পারে। এ মত বিরোধ যদি বিবাদে পরিণত হয় তা হলে স্মরণ করতে হবে যে কোন মুসলমানের জন্য বিবাদে লিপ্ত থাকার অনুমতি নেই।

কোন সৃষ্টির এ প্রশ্ন করার অবকাশ নেই, কেন আল্লাহ মানুষকে তার বর্তমান প্রকৃতিসহ সৃষ্টি করলেন, কেন এ প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতাকে স্থায়িত্ব দিলেন এবং অবতীর্ণ জীবন-বিধান অবোধগম্য, অলৌকিক কোন পন্থার পরিবর্তে মানুষের চেষ্টা-সাধনার মধ্যে বাস্তবায়ন কেন পছন্দ করলেন। এ বিষয়টি প্রত্যেকেরই বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেকের উচিত ইতিহাসের ঘটনা-প্রবাহ ও সভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারা হৃদয়ঙ্গম করা এবং এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। সাথে সাথে ঐতিহাসিক প্রবাহকে প্রভাবিত করার উপায় উদ্ভাবন করা। আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান আর শক্তি নিয়ে তাকে বাঁচতে হবে। সেগুলোর প্রতি যথার্থ দৃষ্টিভংগীও পোষণ করতে হবে।

মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ (স) কর্তৃক আনীত জীবন-বিধান এ পৃথিবীতে মানব সমাজে অবতীর্ণ বিধান হওয়ার কারণে সরাসরি কায়েম হয়ে যায় না। মানুষের কাছে তার ঘোষণা প্রচারণার ফলেও সে কায়েম হয় না। আল্লার বিধান নভোমণ্ডল ও গ্রহ-জগতে যেভাবে কার্যকর, এখানে সেভাবে কার্যকর হয় না। এখানে তা রূপায়িত হয় একদল মানুষ দ্বারা, যারা এটাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, স্বীয় জীবনে বাস্তবায়িত করে এবং সমাজ জীবনে একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এরা তাদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সংগ্রাম করে আল্লার বিধান-বিরোধীদের বিরুদ্ধে।

এরা ইসলামী বিধান কার্যকরী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে মানব-প্রকৃতি ও

বস্তুগত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সম্ভব এমন এক পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম। একজন মানুষকে যেমনটি পায়, তেমনটি নিয়েই তারা কাজ শুরু করে। ক্রমশঃ তার জীবনে পরিবর্তন সূচিত করে। এরা কখনোবা নিজেদের ও অপরের ওপর বিজয়ী হয়। কখনো বা নিজ সত্তাও অপরের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়। তাদের প্রচেষ্টা ও যুগোপযোগী উপকরণের পরিমাণের আলোকে তাদের জয় বা পরাজয় হয়ে থাকে। এ জয়-পরাজয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শের অনুসরণ এবং আচার-আচরণে তার প্রতিফলন।

এ হলো ইসলাম ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতির প্রকৃতি। ইসলামকে বাস্তব রূপ দানের এটা হলো নীল নক্শা। এ সত্যটাই আল্লাহ্ আমাদেরকে শেখাতে চান এভাবেঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে যা আছে তার পরিবর্তন করে।" "আল্লাহ্ যদি এক দল দ্বারা আরেক দলকে পরাভূত না করতেন, তাহলে পৃথিবী ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো।" "যারা আমার পথে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে পথ দেখাই।"

ওহোদের বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে এ সত্যটাই বুঝানো হলো মুসলিম-দেরকে। ওহোদ যুদ্ধকালে মুসলিম বাহিনী এখানে সেখানে ইসলামের যথার্থ অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। মুসলিমগণ ভেবেছিলেন, মুসলিম হওয়ার কারণে তাঁদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্ তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ "যখন তোমরা একটা বিপদের সম্মুখীন হলে যেমন হয়েছিলে আরেকবার, এর আগে তোমরা বললেঃ এটা কেমন ব্যাপার? বলঃ এটা তোমাদের কাছ থেকেই এসেছে।" আল্লাহ্ আরো বললেনঃ "আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা সত্য প্রমাণ কর-লেন যেন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে ওদেরকে পরীক্ষা করতে পার। তোমরা ব্যর্থ হলে এবং এ ব্যাপারে মতবিরোধ করলে। তোমরা যা ভালবাস তা তিনি তোমাদেরকে দেখানোর পরেও তোমরা বিদ্রোহ করলে। তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা পৃথিবীর আকাংখা করে আবার তোমা-দের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা পরকালকে আকাংখা করে। তার পর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে দূরে ঠেলে দিলেন যেন তিনি তোমা-দেরকে পরীক্ষা করতে পারেন।"

মুসলিমগণ এ সত্য উপলব্ধি করলেন ওহোদের ময়দানে। ভৎ'সনার মাধ্যমে নর—রক্তদান ও দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের মাধ্যমে। এটা ছিল চড়া দাম : বিজয়ের পর পরাজয়। গনিমতের মালের পরিবর্তে সর্বস্ব হারানো। এমন আঘাত যা সবাইকে আহত করলো। হামজা (রা)-র মতো অনেক মহান ব্যক্তি হলেন শহীদ। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার ছিল মুহম্মাদুর রসুলুল্লার শরীরে আঘাত প্রাপ্তি। তিনি মাথায় আঘাত পেলেন। একটা প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর দাঁত ভেঙ্গে গেল। আবু আমর নামক কোরাইশদের এক সহ-যোগী একটা গোপন গর্ত খুদিত করে রেখেছিল। সে গর্তে পড়ে গেলেন আল্লার নবী। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে কোরাইশ বাহিনী মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালালো। বিশ্বনবীকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে অনেক সাহাবী হলেন শহীদ। আবু দাজানা (রা) বিশ্বনবীকে বাঁচাবার জন্য দুশমনদের তীরের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর পিঠ বিদ্ধ করতে থাকলো। তিনি নড়লেন না। অপরাপর সংগীরা ছুটে না আসা পর্যন্ত তিনি প্রিয় নবীকে আড়াল করে রইলেন। এ ঘটনা এটাই প্রমাণ দিল যে, ইসলামের বাস্তবায়ন মানবিক চেষ্টা-সাধনা ও শক্তি-সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের মধ্যে একটা আন্দোলন—সংগ্রাম—পরিচালনা করতে হয়। এ সংগ্রাম অনিচ্ছা ও অনীহার বিরুদ্ধে। লোকদেরকে ইসলামের পথে আনার প্রয়োজনে। এটা জবানের সংগ্রাম। জুলুম-নির্যাতন ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথের প্রতিবন্ধকতা উৎপাটনের সংগ্রাম। এ সংগ্রাম পরিচালনা করতে গেলে দুঃখ-দুর্দশার শিকার হতে হয়। আর এ দুঃখ দুর্দশায় প্রয়োজন ধৈর্য-ধারণের। সংগ্রাম সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেও ধৈর্যের প্রয়োজন। সে সময়ে ধৈর্য অবলম্বন করা তো রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।

এ সংগ্রাম-সাধনা সবাইর জন্য। কোন ব্যক্তি যখন এ ময়দানে নামে তখন সে শুধু অন্যলোকের সাথেই সংগ্রামে নিয়োজিত হয় না। সে তার নিজ সত্বার বিরুদ্ধেও সংগ্রামে রত হয়। এ সংগ্রাম তার চিন্তাকে শানিত করে। কর্মের দিগন্ত প্রসারিত করে। চুপ করে বসে থাকা মানুষ চিন্তার প্রাখর্য্য ও কর্মের উল্লাস পেতে পারে না। আন্দোলন ও সংগ্রাম চালাতে গিয়ে এক

ব্যক্তি জীবনকে ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে শিখে। উপলব্ধি করতে পারে গোটা জগতের রহস্য, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। সংগ্রামরত মানুষের আত্মিক সত্বার উন্নতি, অনুভূতি ও কল্পনা শক্তির প্রাখর্য্য এবং স্বভাব-প্রকৃতির উৎকর্ষ অর্জিত হয়।

"আল্লাহ যদি একদল লোক দিয়ে আরেক দলকে না দমাতেন, তাহলে পৃথিবী ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে দূষিত হয়ে যেতো।" সমাজ দূষিত হওয়ার আগে দূষিত হয় মানুষের মন। দূষিত মন সজীবতা হারিয়ে ফেলে। মনের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর ব্যক্তির সার্বিক সত্বাই স্থবির হয়ে পড়ে। অথবা কেবল প্রবৃত্তি-পূজার ক্ষেত্রেই সে সজীব থাকে। মন উন্নতির পরিবর্তে অবনতির দিকে ধাবিত হয়। যেমনিভাবে অধঃপাতের দিকে ধাবিত হয় বিলাসিতা কবলিত কোন জাতি। আল্লাহ মানব-প্রকৃতির কল্যাণ-সাধনকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আর এ সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে সার্বিক শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করে।

এ সংগ্রামের সাথে আসে বাধা। সে বাধা আনে দুঃখ-যন্ত্রণা। আর সে দুঃখ-যন্ত্রণা ব্যক্তির জীবনকে পরিশুদ্ধ করার অমোঘ হাতিয়ার। বাধা-বিপত্তি অলস, দুর্বলচেতা, প্রতারক ও মুনাফিকদেরকে ভয় লাগিয়ে দেয়। তারা দূরে সরে পড়ে। তাদের কবলমুক্ত হয় সমাজ। সমাজ-পরিবেশ পরিশুদ্ধির এটা একটা বাস্তব পদ্ধতি।

আল্লাহ মুসলিম জাতিকে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। বিপদের হাতুড়ীপেটা, কঠিন অবস্থার মোকাবিলা এবং দুঃখ-বেদনার তিক্ততা দিয়ে এ পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষা-পদ্ধতির ফলে মিল্লাত পরিশুদ্ধ হয়। এ মহা সত্যই আল্লাহ মানুষকে শেখাতে চেয়েছেন। "এটা কেমন ব্যাপার?" এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন: "যখন তোমরা একটি বিপদের সম্মুখীন হলে যেমন হয়েছিলে আরেকবার, এর আগে তোমরা বললে: এটা কেমন ব্যাপার? বল: এটা তোমাদের কাছ থেকেই এসেছে।" আল্লাহ আরো বললেন: "আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্য প্রমাণ করলেন যেন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে ওদেরকে পরীক্ষা করতে পার। তোমরা ব্যর্থ হলে এবং এ ব্যাপারে মতবি-রোধ করলে। তোমরা যা ভালবাস তা তিনি তোমাদেরকে দেখানোর পরেও

তোমরা বিদ্রোহ করলে। তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা পৃথিবীর আকাংখা করে। আবার তোমাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা পরকাল আকাংখা করে। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে দূরে ঠেলে দিলেন যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন।"

এসব কথা ওহোদের মুজাহিদদের অন্তরে গেঁথে গেল। লড়াইয়ের ময়দানে চিন্তা ও কাজে পূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করা হয়নি। পরিণামে নেমে এলো বিপর্যয়। এ বিপর্যয় শেষ পর্যন্ত তাঁদের জন্যে কল্যাণ এনেছিল। তাঁরা তো আল্লার ক্ষমা পেলেন। সাথে সাথে পেলেন এক সুশিক্ষা। শিখলেন নিজেদেরকে—নিজের বাহিনীকে—পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি।

ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে মানবিক চেষ্টা-সাধনা এবং বস্তুগত বাস্তবতার প্রতি গুরুত্ব আরোপকে যেন ভুল না বুঝা হয়। এর অর্থ এটা নিশ্চয়ই নয় যে এ ব্যাপারে মানুষ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার অধিকারী। অথবা সে আল্লার পরিকল্পনা এবং সহায়তার অধীন নয়। বিষয়টিকে এভাবে গ্রহণ করাটা ইসলামী চিন্তাধারার পরিপন্থী। অবশ্য আল্লাহ সাহায্য করেন তাকে যে সত্য পথ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে। "যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে, আমি তাদেরকে পথ দেখাই।" "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা তাদের মাঝে যা আছে তার পরিবর্তন সাধন করে।" এ দু'টো আয়াত থেকে মানবিক চেষ্টা-সাধনা এবং আল্লার সাহায্যের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আল্লার সাহায্যেই মানুষ পুণ্য পাবে, সত্য পথ পাবে এবং কল্যাণ পাবে। কিন্তু সে সাহায্য পাওয়ার জন্য তাকে তার শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। আল্লার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া মানুষ কিছু পাবে না। কিন্তু আল্লার সাহায্য তার জন্যই আসে যে সাহায্য লাভের উপযুক্ততা প্রমাণ করে এবং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্যই সংগ্রামে রত থাকে। আল্লার ইচ্ছা, পরিকল্পনা এবং নির্দেশ বিশ্ব জুড়ে কার্যকর। এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার বা হস্তক্ষেপ করার কেউ নেই। এ মহাসত্যকে অন্তরে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করতে না পারলে ঈমানের পূর্ণত্ব অর্জন সম্ভবপর নয়।

একটি অনন্য পথ

প্রশ্ন উঠতে পারে অবতীর্ণ জীবন বিধান ইসলামকে যদি মানবিক চেষ্টা-সাধনা, শক্তি-সামর্থ্য ও বস্তুগত-বাস্তবতার ওপরে নির্ভর করেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, তাহলে মানব রচিত মতবাদগুলো থেকে তার পার্থক্য রইলো কোথায় ? অন্যান্য মতবাদের মতো এর প্রতিষ্ঠার জন্যও যদি মানব-প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, তাহলে নির্দিষ্ট করে এর জন্যই আমরা প্রচেষ্টা চালাতে যাব কেন ? এর তো কিছুই অলৌকিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না।

এ প্রসংগে প্রথমেই জেনে নেয়া দরকার আসলে ইসলাম কি ? ইসলামের প্রথম স্তম্ভ, সাক্ষ্যদান। আমরা সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহম্মদ (স) আল্লার বার্তাবহ। এ সাক্ষ্য দানের মোটামুটি অর্থ: আল্লাহ ইলাহ হওয়ার সব গুণের মালিক। কোন সৃষ্টি তাঁর গুণাবলীর অংশীদার নয়। তিনি সার্বভৌম। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য আইন প্রদান, পথ-নির্দেশ প্রেরণ এবং তাদের জন্য মূল্যমান নির্ধারণের অধিকারী। জীবন বিধান প্রদানের অধিকার আল্লার, একথা উপলব্ধি না করে এবং মানব জীবনে অবতীর্ণ জীবন বিধান প্রয়োগের প্রচেষ্টা না চালিয়ে 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' এ কথার প্রকৃত সাক্ষ্যদান অসম্ভব। যে ব্যক্তি মানব জাতির জন্য জীবন বিধান রচনার অধিকার দাবী করে সে প্রকৃতপক্ষে ইলাহ হওয়ার যোগ্যতার দাবীই করে থাকে। কেন না সে তখন ইলাহ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী হওয়ার দাবী করে; 'মুহম্মদ (স) আল্লার বার্তাবহ' এ কথার সাক্ষ্যদানের মোটামুটি অর্থ: বিধান তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে। এ বিধানই মানব জাতির জন্য নির্দেশিত পথ। কেবল এ বিধানই

অনুসরণ করতে হবে। মানব জীবনে এর প্রতিষ্ঠার জন্য চালাতে হবে আন্দোলন।

এ জীবন বিধান মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়। মানুষকে সত্যিকার আজাদী দান করে। গোলামীর জিঞ্জির তার গলা থেকে খুলে ফেলে। সে তখন আল্লার আনুগত্য এবং মানবতার গণ্ডীর মধ্যে থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ পায়। এক আল্লার অধীনতা তাকে অন্য সব কিছুর অধীনতা হতে মুক্তি দান করে। এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আর কোন জীবন বিধান পৃথিবীতে নেই। ইসলাম আল্লাকে ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এবং আল্লার জন্য জীবন বিধান রচনার অধিকার স্বীকার করে নিয়ে মানুষের জন্য একজন মাত্র ইলাহ—একজন মাত্র প্রভু—নির্দিষ্ট করে। নির্দেশনা ও আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষকে দিয়ে তাকে অপরাপর মানুষের প্রভু সাজার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে ইসলাম। এ দিক দিয়ে আল্লার বিধান অনন্য। এটা শুধু মাত্র কথা নয়, বাস্তব সত্য। প্রত্যেক নবীর প্রচারিত বাণীর মৌলিক কথা ছিলো: আল্লাহ ইলাহ হওয়ার সব গুণের অধিকারী। অন্য কোন শক্তির এ যোগ্যতা নেই। খৃষ্টান ও ইহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "তারা তাদের ধর্ম-যাজকদেরকে আল্লার পরিবর্তে তাদের প্রভু বানিয়েছে। এমনিভাবে গ্রহণ করেছে ঈসা ইবনে মরিয়মকে। অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এক আল্লার ইবাদতের। তিনি তা থেকে মুক্ত যা তারা তাঁর প্রতি আরোপ করে।" তারা ধর্ম যাজকদেরকে সিজদা করতো না। কিন্তু তারা জীবন বিধান রচনার ক্ষেত্রে আল্লার সাথে তাদেরকে শরীক করতো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: "এরা ওদেরকে প্রভু বানিয়েছে।" এরা একত্ববাদ সম্পর্কে আল্লার নির্দেশ অমান্য করেছিল এবং তাঁর প্রতি অংশীদারিত্ব আরোপ করেছিল।

হাদীসবেত্তা ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিজী এবং ইবনে জারীর উদাই ইবনে হাতিম সম্পর্কে বলেছেন যে, যখন সে আল্লার রসূলের আহ্বান শুনলো, সিরিয়ায় পালিয়ে গেল। প্রাক-ইসলাম যুগে সে খৃষ্টবাদে দীক্ষিত হয়। তার বোন এবং কতিপয় আত্মীয় মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল। বিশ্বনবী তার বোনকে মুক্তি দান করেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় গিয়ে তাঁর ভাইকে

তালাশ করে বের করলেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা দিতে থাকলেন। অবশেষে উদাই মদীনায় এল। সে ছিল তাঈ গোত্রের অন্যতম প্রধান। তার পিতা হাতিম তাঈ দানশীলতার জন্য সারা দেশে সুখ্যাত ছিলেন। উদাই-এর আগমনে বেশ সাড়া পড়ে গেল। গলায় একটা সোনালী ক্রস ঝুলিয়ে উদাই রসূলুল্লার নিকটবর্তী হল। রসূলুল্লাহ তখন এ আয়াত পড়লেন: "এরা তাদের ধর্ম-যাজকদেরকে আল্লার পরিবর্তে তাদের প্রভু বানিয়েছে।" উদাই বলল: 'তারা তো তাদের পূজা করে না।' রসূলুল্লাহ বললেন: "প্রকৃতপক্ষে তারা তা করে। ধর্ম-যাজক দল বৈধ জিনিসকে অবৈধ এবং অবৈধ জিনিসকে বৈধ ঘোষণা করেছে। তারা এ সব অনুসরণ করছে। এটাই হল তাদের পূজা।" আস সাঈদ বলেছেন: "মানুষের উপদেশ নাও। কিন্তু তা আল্লার কিতাবের সাথে তুলনা করে নেবে।" সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন: "এক আল্লার ইবাদত করতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।" এ এক আল্লাহ যা কিছু নিষেধ করবেন তা-ই অবৈধ। তিনি যা কিছুর অনুমতি দেবেন তাই বৈধ। কোন বিষয়ে তিনি যে বিধি প্রদান করবেন, তা মানতে হবে। তিনি যে নির্দেশ দেবেন, তা কার্যকরী করতে হবে। ইবাদতকে শুধু আল্লার জন্য নির্দিষ্ট করে কেবল ইসলাম। কেননা তা আল্লাকে সার্বভৌমত্বের মালিক এবং আইন প্রণেতা বিবেচনা করে।

আল্লার প্রতি আত্মসমর্পী বানিয়ে ইসলাম অন্যান্য শক্তির গোলামী থেকে মানবতাকে মুক্তি দান করে। আর সে জন্য এটা ওটা নয়, শুধু ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত হওয়া উচিত। ইসলাম মানুষের বাসনা, দুর্বলতা ও স্বার্থপরতার পরিণতি হতে মুক্ত। নিজের জন্য, নিজ পরিবারের জন্য, সম্প্রদায়, গোত্র বা জাতির জন্য বিধি-বিধান তৈরী করে স্বার্থোদ্ধারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইসলাম। ইসলামী বিধান প্রণয়নকারী খোদ আল্লাহ—বিশ্ব মানবতার প্রভু। তিনি নিজের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করেন না। অথবা মানব জাতির একাংশের জন্যও তা করেন না। একজন শাসক অথবা শাসক-পরিবার, সম্প্রদায় বা জাতি কর্তৃক রচিত কোন বিধি-বিধান তার বা তাদের কামনা-বাসনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে না। আল্লার প্রণীত আইনের এ দোষ নেই। তাই এ আইনের

দ্বারা মানব জীবন শাসিত হলে সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। মানব রচিত মতবাদ দ্বারা কোন দিন তা লাভ করা সম্ভব নয়। মানব রচিত মতবাদগুলো হয় স্বার্থপরতা দ্বারা দুষ্ট হবে, নয় মানবিক দুর্বলতা দ্বারা আক্রান্ত হবে। এ ত্রুটি থেকে এগুলোকে পরিশুদ্ধ রাখার কোন উপায় নেই।

ইসলাম ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আত্মীয়তার উর্ধে উঠে ন্যায়-বিচার কায়েমের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে বলেন: "ওহে মুমিনগণ, তোমরা আল্লার সামনে অকপট হও। ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হও। লোকদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে ন্যায়-পরায়ণতা ত্যাগ করোনা। ন্যায় কাজ কর। এটা পুণ্যের অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাকে ভয় কর। তোমরা যা কিছু, কর আল্লাহ তা অবগত আছেন।"

প্রশ্ন হতে পারে, ন্যায়-বিচারের এ নির্দেশ মুসলিম জাতি পালন করবে তার কি গ্যারান্টি আছে। ইসলামী কার্যক্রমের প্রকৃত গ্যারান্টি একজন মুসলিমের বিবেকের মাঝে নিহিত। এটার উৎস তার ঈমান। যতদিন এ ঈমান থাকবে ততদিন ন্যায়-বিচারের দৃঢ় গ্যারান্টি থাকবে। ইসলাম শিক্ষা দেয়, এ জগতে মুসলিম জাতির স্থিতিশীলতা, তাদের বিজয় ও তাদের আধিপত্য আল্লার নির্দেশসমূহ পালনের ওপর নির্ভরশীল। এর ব্যতিক্রম হলেই তারা অধঃপাতে যায়। তাদের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়। তাদের জীবনে লাঞ্ছনা, দুর্ভোগ নেমে আসে। তারা জানে: "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিজয় দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সক্ষম, শক্তিমান। তিনি যাদেরকে আধিপত্য দেন তারা সালাত কায়েম করে, জাকাত ব্যবস্থার প্রচলন করে, ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং অন্যায়কে প্রতিহত করে। আল্লার কাছেই সব কাজের চূড়ান্ত পরিনতি।" তারা জানে যদি তারা আল্লার পথ থেকে দূরে সরে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে সুনজরে দেখবেন না। মুসলিম জাতির অস্তিত্বই একটা বড় গ্যারান্টি। এ জাতি কতগুলো প্রত্যয়-বিশ্বাসের ওপর গড়ে উঠেছে। আল্লার নির্দেশ পালনকে তারা কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে। এ নির্দেশের অবজ্ঞা ও অবহেলা তাদের জন্য অকল্যাণ বহন করে আনে— এ কথায় তারা বিশ্বাসী। আর সে কারণেই মুসলিম জাতি ন্যায় বিচার কায়েম করতে বাধ্য।

ইসলাম মানবিক অজ্ঞতা ও দুর্বলতার প্রভাব মুক্ত। এ বিধানের প্রণেতা খোদ মানুষের স্রষ্টা। তিনি ভালভাবেই জানেন মানুষের জন্য কল্যাণকর পথ কোনটি। তিনি তাদের স্বভাব-প্রকৃতির নাজুকতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। মানুষের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা এবং তার কার্যকারিতাও তাঁর জানা। মানুষের জন্য পথ-নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি এসব বিবেচনা করেন। এ কাজ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সঠিক ও পূর্ণাংগ অনুধাবনের জন্য তো প্রয়োজন মানব জীবনের অতীতের জ্ঞান, বর্তমান-ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট অবগতি এবং পারিপার্শ্বিকতার পূর্ণাংগ তথ্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারেনি, পারে না, পারবেও না। দৃশ্যমান জগত এবং অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সে হিমসিম খায়। মানুষের প্রকৃতি এমন যে এ কাজ তার পক্ষে দুঃসাধ্য। এর সাথে সাথে তো আছে প্রবৃত্তি ও মানবিক দুর্বলতার রশিটানা। তাই মানুষের জন্য নির্ভুল ও যথোপযুক্ত জীবন বিধান প্রণয়ন মানুষের সাধ্যাতীত। আল্লাহ্ বলেন: "সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো, আসমান ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো।" "আমি তোমাদের জন্য বিধান দিয়েছি। একে অনুসরণ কর এবং জ্ঞানহীনদের আন্দাজ অনুমান ও কল্পনার অনুসরণ করোনা।" পূর্ণাংগ জ্ঞানের অভাবে আন্দাজ অনুমান ভর করেই মানুষকে জীবন বিধান রচনা করতে হয়। এ কাজ মানুষের জন্য নয়।

ইসলামী মতবাদ অস্তিত্বের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে মানব জীবনের জন্য একটা ব্যবস্থা দিয়েছে। এ মতবাদ মানব-সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যাদান করে। মানব জীবনের একটা স্বাভাবিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার এটাই একমাত্র নির্ভুল ও মজবুত বুনিয়াদ। অস্তিত্বের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ যে বিধানে নেই তা অপূর্ণাংগ ও ত্রুটিযুক্ত। সে ব্যবস্থা স্বাভাবিক ব্যবস্থা নয়। তার আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হতে পারে না। যতদিন ওটা পৃথিবীতে বেঁচে থাকে, ততদিন অকল্যাণের উৎস হিসেবেই বেঁচে থাকে। মানব প্রকৃতি তাকে ধ্বংস না করে দেয়া পর্যন্ত সে অকল্যাণের বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে। সামগ্রিক অস্তিত্ব সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য নির্ভুল। কেননা গোটা জগতের স্রষ্টার কাছ থেকেই এসেছে

ইসলাম। তিনি মানুষের স্রষ্টা। মানব প্রকৃতির স্রষ্টা। বিশ্ব-জগত, তার মাঝে মানুষের পজিশন এবং মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণকারী অন্যান্য সব মতবাদ খুঁতযুক্ত। বিশ্ব-জগত মানুষের তুলনায় অনেক বড় এবং মানুষ তার সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দিতে হলেও মানুষের স্রষ্টা এবং তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। এ ব্যাখ্যা দিতে হলে নিজে সব ভ্রান্তির উর্ধে অবস্থান করতে হবে। মানুষের পক্ষে তা কোনদিনই সম্ভব নয়।

দর্শনশাস্ত্র মানুষের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছে। চেষ্টা করেছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তার পজিশন নির্ণয় করতে। একটা মাত্র উত্তর তা দিতে পারে নি। কতগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তো রীতিমতো হাস্যকর। দার্শনিক একজন মানুষ। তাই তার আজগুবী ধ্যান-ধারণা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনে আমরা খুব অবাক হই না। দার্শনিক পথ চলেন। একস্থানে এসে থমকে দাঁড়ান। আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলেন। একটু আলোও আর দেখতে পাননা। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য দুর্বোধ্য বলেই তিনি হাল ছেড়ে দেন। কিন্তু সে আঁধারে তাকে পথ দেখায় একটি বক্তব্য। তা হলো : মানুষ পৃথিবীতে আল্লার প্রতিনিধি। জীবন সম্পর্কে এ ধারণা থেকে উৎসারিত হয় একটা সুস্থ চিন্তা প্রবাহ। মানুষের এ পজিশন উপলব্ধি করলে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে একটা ব্যবস্থা। স্বাভাবিক ভিত্তির ওপর একটা কল্যাণজনক ব্যবস্থা গড়ে তোলা মানুষের কাম্য। এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সৃষ্টি জগতের সামগ্রিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যশীল বিধান ইসলাম। সামঞ্জস্যহীন পথে মানুষের পা বাড়ানো উচিত নয়। সামগ্রিক পরিকল্পনার কাঠামোতে পূর্ণাংগ সহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করাই তার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। সৃষ্টি জগত ও মানব জীবনের পারস্পরিক সংঘর্ষ এড়াবার জন্য এ সামঞ্জস্যশীল জীবন বিধানের অনুসরণ অত্যাবশ্যক। সাংঘর্ষিক জীবন যাত্রা অবলম্বন করলে মানুষকে ধ্বংসের মুখোমুখী এসে দাঁড়াতে হয়। সৃষ্টি জগতের স্বাভাবিক নিয়মাবলীর সাথে সাম্মিল জীবন যাপন করে মানুষ তার অসীম রহস্যাবলীর জ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে পারে। এবং এ জ্ঞানকে তার জীবনে

কাজে লাগাতে পারে। তখনি তো সে আগুনকে রন্ধন, উত্তাপ সৃষ্টি এবং আলো দানের কাজে ব্যবহার করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে মানব প্রকৃতির সাথে সৃষ্টি জগতের একটা মিল আছে। কাজেই সৃষ্টি জগতের সাথে সংঘাতের সম্মুখীন হওয়া মানে তার নিজ প্রকৃতির সাথে সংঘাতে নামা। তখন তাকে বিজ্ঞানের বিজয়াভিযান এবং সভ্যতার অবদানসত্ত্বেও দুঃখ ব্যাকুলতা এবং উদ্বেগের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। আজকের মানুষ, দুঃখ, ব্যাকুলতা, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা দ্বারা আক্রান্ত। মানুষ আজ আপন সত্তা থেকে পালাতে চায়। এ পালানোর প্রয়াসেই সে আফিম গ্রহণ, মদ্যপান, দ্রুত ড্রাইভিং এবং অপরাপর নিরর্থক কাজ ও অভিযানে লিপ্ত হয়। সে যেন আজ আত্মগোপন করতে চায়। অনেক পণ্য দ্রব্য, বস্তুগত সমৃদ্ধি, আরামপ্রদ জীবনযাত্রা এবং যথেষ্ট অবসর-অবকাশ ভোগ করা সত্ত্বেও সে এমনটি করছে। বস্তুতঃ বস্তুজগতে সমৃদ্ধি যতই বাড়ছে, তার মনের শূন্যতা যেন ততই বাড়ছে। বাড়ছে তার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। বাড়ছে অস্বস্তি। মনের কোণে এক মহাশূন্যতার উপলব্ধি তাকে এক ভয়ঙ্কর ভূতের মতো তাড়া করছে। এ অবস্থা থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে চায়। এতসব করেও সে নিষ্কৃতি পায় না। তার পলায়ন প্রচেষ্টার যেন ইতি নেই।

আমেরিকা এবং সুইডেনের মতো বিত্তশালী দেশগুলোর দিকে তাকান। এসব দেশের মানুষ ভূতের হাত থেকে বাঁচার উদ্যোগ নিয়ে পলায়নরত। তাদের বস্তুগত উন্নতি, ইন্দ্রিয়গত সুখভোগ এবং যৌন তৃপ্তি তাদেরকে শান্তি দিচ্ছেনা। স্নায়বিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি, যৌন বিকৃতি, সার্বক্ষণিক উদ্বেগ, উন্মাদনা, অপরাধপ্রবণতা এবং মানব মর্যাদার অবমাননার দিকেই তো তারা ছুটে চলছে। বিজ্ঞান চর্চার ফলে মানুষ চিকিৎসার ক্ষেত্রে গৌরব অর্জন করেছে। সে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি ও অষুধ আবিষ্কার করেছে। চিকিৎসা জগতে পেনিসিলিন ও মাইওসিনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও মানুষ অবিশ্বাস্য রকমের উন্নতি সাধন করেছে। মহাশূন্য অভিযান, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপন, শূণ্যলোকে ষ্টেশন স্থাপন ইত্যাদি মানুষের কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু এসবের কি প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবনে অথবা তার আত্মিক জীবনে? মানুষ কি শান্তি লাভ করতে পেরেছে? নিশ্চয়ই

না। তার জীবন ভীতি, অশান্তি ও উদ্বেগে পরিপূর্ণ। জীবনের লক্ষ্য সে স্থির করতে পারেনি। নির্ণয় করতে পারেনি মানব সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য। 'সভ্য' মানুষ আজ তার নিজের অস্তিত্ব এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এমন সব কথা বলেযা শুনে সভ্যতা অভিশাপ বলেই প্রতিভাত হয়। আমেরিকার মানুষ আজ নতুন নতুন খোদার পূজা শুরু করেছে। ও সব নতুন খোদা হলো সম্পদ, আমোদ-প্রমোদ, খ্যাতি-যশ এবং অধিক উৎপাদন। এগুলোর পূজাকেই এখন সে তার জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। আমেরিকার মানুষ তো নিজেকে খুঁজে পায় না। কারণ অস্তিত্ব বা জীবনের লক্ষ্যই তো সে খুঁজে পায় না। এ কথাটা অন্যান্য অনেক দেশের মানুষের জন্যও প্রযোজ্য। ও সব দেশের মানুষ সত্যিকার প্রভুকে দেখে না।

বিশ্ব মানবতার এই যখন অবস্থা তখন ইসলামকে তাদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মানবমণ্ডলীকে এক মহান আল্লার দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সে মহান ও স্বাভাবিক নিয়মাবলীর দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে যেগুলো গোটা বিশ্ব ও মানুষের অস্তিত্বকে বেষ্টন করে আছে। "তারা কি আল্লার পথ ছাড়া অপর কোন পথের সন্ধান করে যেখানে আসমান এবং পৃথিবীর সব কিছু স্বেচ্ছার বা অনিচ্ছায় তাঁর আনুগত্য করছে এবং তাদেরকেও তাঁর সম্মুখে হাজির করা হবে ?"

একটি সহজ পথ

কেউ কেউ যুক্তি দেখান : মানুষ দীর্ঘদিন ইসলামের অনন্য ও মহান পথে চলতে পারে না। কোথাও হয় তো মানুষ তাকে একবার গ্রহণ করলো। কিছুকাল তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলো। তারপর সে তাকে পরিত্যাগ করবে। অন্য কোন পথ তালাশ করবে। অন্য কোন মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হবে, এটাই স্বাভাবিক।

আপাতঃ দৃষ্টিতে কথাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। অনেক লেখক মানুষের মনে ইসলামের প্রতি অনীহা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা বুঝাতে চেয়েছেন, ইসলাম একটা ভারী বোঝা। একটা কঠিন জীবন বিধান। এর বোঝা বহন করা দুঃসাধ্য। এটা এমন আদর্শবাদিতা যা অর্জন করা মানবিক যোগ্যতার পক্ষে অতীব কষ্টকর।

এ প্রচারণার পেছনে একটা ধূর্তামী আছে। এঁরা মানুষের মনে নিরাশাবাদ সৃষ্টি করতে চান। ইসলাম অনুসরণের সম্ভাব্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতে চান। ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করাই এর উদ্দেশ্য। এ ধূর্ত লোকগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম জাতির ভুল-ভ্রান্তিগুলো তালাশ করেন। ইসলামকে অচল প্রমাণ করার জন্য খোঁড়া যুক্তির অবতারণা করেন। ওসমান (রা)-র হত্যার পরবর্তী বিশৃংখলা এবং আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার বিবাদকে এঁরা যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেন। সরলমনা অনেক মুসলিমও কোন কোন সময় এ সব প্রচারণার শিকারে পরিণত হয় এবং পরোক্ষভাবে ধূর্ত লোকগুলোর উদ্দেশ্যটাকে সফল করে তোলেন।

এটা সত্য যে মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ এবং প্রথম দু'জন খলীফার শাসন-কাল ছিল ইসলামের সোনালী যুগ। ইসলাম তখন পূর্ণভাবে বিকশিত ছিল। পরবর্তীকালে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায়নি। আরো পর-বর্তীকালের লোকেরা ধীরে ধীরে ইসলামের পথ থেকে সরে যেতে থাকেন। মুসলিম জাতির নেতাদের অনেকেই ইসলামের নিয়মাবলী ও বিধান হতে দূরে সরে পড়েন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সোনালী যুগের পর পরই ইসলাম বিকাশের সব কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুরো বিষয়টি ভালোভাবে বিবেচনা করতে হবে। মানব-প্রকৃতি এবং কর্মধারাকেও বিশ্লেষণ করতে হবে। আর এ জীবন বিধানটির বৈশিষ্ট্যও আমাদের কাছে ভালোভাবে জানা থাকা দরকার। কালের দৈর্ঘ এবং পারিপার্শ্বিকতার বিভিন্নতায় মানুষের জীবনযাত্রা প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এ জীবন বিধানের নীতিও ভালোভাবে বুঝা দরকার।

এটা মোটেই সত্য নয় যে ইসলাম একটা বোঝা। মানুষের পক্ষে বেশী সময় ধরে তাকে মেনে চলা সম্ভব নয়, এ কথা অযৌক্তিক। ইসলাম এক সুমহান পথ। এটা একটা স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা। মানুষের প্রকৃতি এর পুঁজি। এ পুঁজি ইসলাম অর্জন করে অতি সহজে। মানবাত্মার সাথে এর সম্পর্ক। মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করার যোগ্যতা তার আছে। ইসলাম মানুষের আত্মিক শক্তি সম্পর্কে সচেতন। মানুষের মনের চাহিদা তার জানা। সে চাহিদা পূরণে তার ভূমিকা অনন্য। মানুষের সম্ভাবনাময়তা এবং সামর্থ্য সম্পর্কে সে অবহিত। সেগুলোকে বাস্তব কর্মে নিয়োজিত করার প্রয়াস সে চালিয়ে থাকে। মানুষের জন্য প্রণীত হওয়ার কারণে মানব প্রকৃতির প্রতি সে কোন দিন উদাসীন ছিল না। মাটির পৃথিবীর মানুষের জন্য সে অবতীর্ণ। তাই মানুষের কর্ম ও আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির সাথে তার সৌহার্দ্য। মানবাত্মা যখন আসল প্রকৃতি নিয়ে বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়, যখন তার চাহিদা পূরণ হয় এবং যথা। তার গঠনমূলক শক্তি মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করে, তখন সে জীব-নের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে প্রবাহিত হয়। তার জন্য নির্দিষ্ট উচ্চাসনে সে আসীন হয়। যাঁরা এ বিধানের বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করেন তারা আসলে এর নৈতিক মূল্যমান দেখে ভীত। নৈতিক কর্তব্যানুভূতি তাঁদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। নৈতিকতাকে তাঁরা শিকল মনে করেন। তাঁদের

কামনা বাসনার সামনে এক বিরাট বাধা বলে এগুলোকে বিবেচনা করেন। আসলে ইসলামের ভুল উপলব্ধি তাঁদের এ বিভ্রান্ত চিন্তার কারণ।

ইসলামী নৈতিকতা কেবল কতগুলো বন্ধন নয়। এ নৈতিকতা তার মূল সত্বায় একটা গঠনমূলক ও ইতিবাচক বাস্তব শক্তি। আত্মোপলব্ধি ও ক্রমোন্নতির পথে এক চালিকা শক্তি। এ ক্রমোন্নতি অতি পবিত্র। ইসলামী নৈতিকতা ইতিবাচকতা ও কর্মের সাথে যুক্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিবাচকতা ও কর্মহীনতা অনৈতিক। কেননা এ দু'টো মানব-প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আর সাংঘষিক এ দৃষ্টিকোণের সাথে-যে, মানুষ পৃথিবীতে আল্লার প্রতিনিধি এবং গঠনমূলক কাজে সব জড় উপায়-উপকরণ ব্যবহারের অধিকারী।

পুণ্যের বিকাশ এবং পাপের দমন একটা নৈতিক ব্যাপার। এখানেই মানব ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদানগুলোর মুক্ত হওয়ার সুযোগ। আল্লার প্রতি আনুগত্যের মানে এ নৈতিক দিকটার সুন্দর উপস্থাপন। নৈতিক বন্ধনগুলোকে পরখ করে দেখলে আমরা সেগুলোকে গতিশীলতা, প্রাণবন্ততা ও মানব-প্রকৃতির যথার্থ মুক্তি হিসেবেই দেখতে পাই।

অবৈধ যৌনাচার থেকে আত্মসংযমের কথাই ধরা যাক। সংযমটাকে বন্ধনের মতো মনে হয়। আসলে এটা প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে মুক্তি। মানুষের ইচ্ছা শক্তির উন্নতি। ইসলাম চায় মানুষ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে শালীনভাবে যৌনসুখ উপভোগ করুক।

এবার দান সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক। এটা স্থূলদৃষ্টিতে একটা চাপানো বোঝার মতো মনে হয়। ইসলাম বলেঃ এক ব্যক্তি তার সব অর্থ-সম্পদ নিজেই ভোগ করবে, এটা অন্যায়। এটা স্বার্থপরতা। অন্যের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে তাকে এগিয়ে আসতে হবে। অর্থ দান করতে হবে অর্থ দানের অভ্যাস লোভ হতে মুক্তির একমাত্র উপায়। এটা লোভের ওপর বিজয় অর্জন এবং সার্বজনীন কল্যাণের জন্য বিবেকের জাগৃতি। কাজেই এটা কোন বন্ধন নয়।

পাপাচারকেই ইসলাম বন্ধন মনে করে। পাপ মানুষের আত্মাকে কয়েদ করে। আত্মাকে অধঃপাতে নিয়ে যায়। ইসলাম কামনা-বাসনা পরাভূত করাকে সত্যিকার মুক্তি বলে বিবেচনা করে এবং তার পূর্ণ নৈতিক বিধানকে এ বুনিয়াদের ওপরেই গড়ে তোলে।

আল্লাহ মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত পথ ছেড়ে অন্য কোন পথে অগ্রসর হলে সে অধঃপতিত হয়। "আমি মানুষকে সুন্দর প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে অধঃপতিত হতে দিয়েছি। অবশ্য তাদেরকে নয়, যারা সত্যিকারের মুমিন ও সৎকর্মশীল।" কাজেই মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল জীবন বিধান তো সেটাই যেটা মানুষকে প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং তাকে পুণ্য পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইসলাম মানব সমাজকে এমনভাবে গড়তে চায় যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচাবার পরিবেশ পাবে, পুণ্যবান ও গঠনমূলক শক্তির প্রাধান্য কায়েম হবে এবং যে সব বাধা মানুষকে পুণ্যের পথে এগুতে দেয় না সেগুলো বিদূরিত হবে।

ইসলামের নৈতিকতা একটা ভারী বোঝা—এ মনোভাব পোষণের আরেকটা বড় কারণ আছে। সেটা হলো অনৈসলামী সমাজে একজন মুসলিমের অগ্নি-পরীক্ষা। ইসলাম বাস্তব জীবন বিধান। ইসলামের দাবী হলো যে যারা এ পথের অনুসারী হবে তারা ইসলামী সমাজ কায়েম করে সে সমাজে বসবাস করবে। এ সমাজে পুণ্য ও পবিত্রতা সুবিদিত হবে এবং সমাজের নেতৃবৃন্দের দ্বারা রক্ষিত হবে। অপরদিকে, পাপ ও অপবিত্রতা বর্জিত হবে এবং নেতৃবৃন্দের দ্বারা সেগুলো সমাজ থেকে নির্বাসিত হবে।

এ ভাবে যখন সমাজ পুনর্গঠিত হয়ে যায়, ইসলামী জীবনযাত্রা করা তখন অতি সহজ হয়ে পড়ে। এ জীবনযাত্রার বিরোধিতা করাই তখন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রবৃত্তির দাসত্ব করা এবং পাপ কাজে নিয়োজিত হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। একদিকে স্বাভাবিক মানব প্রকৃতি অপর দিকে সমাজের নেতৃত্ব তার সম্মুখে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করে। তাই ইসলামের দাবী ঃ গোটা মানব সমাজকে আল্লাহর প্রশাসন এবং আইনের অধীনে আনতে হবে। ইসলাম শাসন নিয়ন্ত্রনের অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দিতে নারাজ। এ নিয়ন্ত্রনাধিকার অন্যের হাতে ছেড়ে দেয়াকে ইসলাম 'শিরক' মনে করে। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই—এ সাক্ষ্যদানের বাস্তব পদ্ধতি হলো আল্লার আইনের বাস্তবায়ন।

জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলাম ও মানব রচিত মতবাদগুলোর দৃষ্টিভংগি

অভিন্ন নয়। এ দৃষ্টিভংগি মৌলিক ভাবেই পৃথক। মানব রচিত মতবাদ মানুষকে আল্লার হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করে। মানুষকে ইন্দ্রিয়াতীত শক্তির প্রভাব-মুক্ত মনে করে। ইসলামের সাথে এখানে এগুলোর বড়ো রকমের বিরোধ। উভয়ের মাঝে এ ব্যাপারে কোন সমঝোতা নেই।

ইসলামী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন ইসলামী সমাজ, ইসলামী পরিবেশ। এ সমাজে সুনির্দিষ্ট, চিরন্তন মূল্যমান বিরাজ করবে। আল্লাহ ও তাঁর বিধানের অজ্ঞতা নিয়ে এ সমাজ গড়া যায় না। এ সমাজ গড়ে উঠে ইসলামের নির্দেশনায়। কেবলমাত্র এ সমাজেই একজন মুসলিম স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। এ সমাজে সৎ জীবন যাপনের জন্য সে সহযোগিতা পায়। ইসলামী নৈতিকতার অনুসরণ করে সে তখন ভেতর ও বাইরে এক অনাবিল শান্তি উপভোগ করতে পারে।

এ পরিবেশ যেখানে নেই, সেখানে একজন মুসলিমের জীবন দুর্বিসহ। কাজেই যে ব্যক্তি মুসলিম হতে চায় তার জেনে নেয়া দরকার, ইসলামের পূর্ণাংগ অনুশীলন সম্ভব নয় একটা মুসলিম পরিবেশ গড়ে না তুলে। ইসলামী সমাজেই কেবল ইসলামের সার্বিক অনুশীলন সম্ভব। তাই ইসলাম এমন এক পরিবেশ সৃষ্টির নির্দেশ দেয় মুসলিমকে।

এটা মোটেই সত্য নয় যে ইসলাম অপরাপর মতবাদের চেয়ে বেশী কষ্টসাধ্য বাধ্য-বাধকতা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়। অন্যান্য মতবাদগুলো মানুষের অজ্ঞতা, দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তির উৎস হতে উৎসারিত। কাজেই পূর্ণাংগভাবে হোক বা আংশিক ভাবে হোক মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে ওগুলোর সংঘর্ষ অনিবার্য। এর পরিণামে মানবাত্মা হয় দুর্ভোগের সম্মুখীন। ওই মতবাদগুলো মানুষের সামগ্রিক সমস্যার আংশিক সমাধান দেয় মাত্র। সমস্যার একদিক সামলাতে গিয়ে সেগুলো আরেক দিককে জটিল করে তোলে। ওই মতবাদের অনুসারীরা দারুন বিপাকে পড়ে যায়। একটা রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে যে নতুন রোগটা সৃষ্টি হয়, তার চিকিৎসা করতে গিয়ে আরেকটা রোগেই জন্ম দেয়। এ ভাবে রোগের পর রোগ সৃষ্টির কাজ চলে অব্যাহত গতিতে। মানব রচিত মতবাদগুলোর ইতিহাস এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ওগুলোতে পরিবর্তন সাধন এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

নিঃসন্দেহে, মানব রচিত মতবাদ মানুষের জন্য কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করে। ওই মতবাদগুলো যুগ যুগ ধরে মানব জাতির ওপর যে দুঃখ-যাতনা চাপিয়েছে তার ফিরিস্তি পর্যালোচনা করলে মন বিস্ময়ে উঠে। নিরপেক্ষ পর্যালোচক ইসলামকে বা ইসলামের বিধানকে মানব জাতির জন্য একটা বোঝা বলার যৌক্তিকতা বা হিম্মত খুঁজে পায় না।

ইসলাম মানুষকে এক অত্যুচ্চ শিখরে আরোহন করাতে আগ্রহী। পথের দৈর্ঘকে সে অস্বীকার করেনা। অস্বাভাবিক ভাবে সে গমনের দ্রুততা বাড়াতে চায় না। স্বাভাবিক বর্ধনের পর্যায়গুলোকে সে এক লাফে পেরিয়ে যেতে চায় না। তার পথ দীর্ঘ—সুবিস্তৃত। একজন মানুষের আয়ুষ্কালও এ দৈর্ঘের মাঝে হারিয়ে যেতে পারে। সুদূরের লক্ষ্যটি অর্জিত হওয়ার পূর্বে মৃত্যু আসার ভয়ে সে বিহ্বল নয়। মানব-রচিত মতবাদ তো কোন এক জেনারেশানেই কাজ শেষ করে যেতে আগ্রহী। লাফিয়ে সম্মুখে এগুবার প্রয়োজনে সেগুলো মানব প্রকৃতির সুস্থিরতা বিনাশ করে। শান্ত-স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হবার ধৈর্য ওগুলোর নেই। ওসব পথ তাই রক্তস্নাত। ওদের হাতে মানবিক মূল্যমান বিধ্বস্ত। ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড ভূলুণ্ঠিত। কালের কোন না কোন অধ্যায়ে মানব-প্রকৃতির হাতুড়ি পেটায় এগুলোও হয় পর্যুদস্ত।

ইসলামের পথ সহজ-সরল। এটা মানব প্রকৃতিকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য গ্রহণ করতে বলে। বলে অন্যান্য লক্ষ্য উপেক্ষা করতে। মানব-প্রকৃতি দুর্বল হতে চাইলে ইসলাম তাকে বলিষ্ঠ করে তোলে। কিন্তু ওটাকে সে ভেংগে ফেলে না। ধ্বংস করেনা। একজন বিজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকের মতই সে মানব-প্রকৃতির সাথে আচরণ করে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যয়ী একজন মনুষের মতই তার ধৈর্য। সে ধৈর্য এক লাফে, এক দৌড়ে অর্জন করা যায় না। তার চাহিদা শুধু এ পথে অগ্রগতির অবিরতি।

একটা বৃক্ষ যেমন প্রথমে মাটির গভীরে তার শিকড় গাড়ে এবং পরে চারিদিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, তেমনিভাবে এ জীবন বিধান মন ও পৃথিবীতে বিকশিত হয়। বিকশিত হয় ধীর-স্থিরভাবে। নিশ্চিতভাবে শেষ পর্যন্ত সে তাই হয়, যেমন তাকে আল্লাহ্ দেখতে চান।

ইসলাম বীজ বপন করে। বীজগুলোকে পাহারা দেয়। স্বাভাবিক

সুস্থিরতায় সেগুলোকে অংকুরিত ও বর্ধিত হতে দেয়। তার ক্রিয়াকাণ্ডে যে পরিমাণ ধীরভাব পরিলক্ষিত হয় তা মানব-প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ। আমরা দেখি ক্ষেতে-খামারে কখনো কখনো চারাগাছ মাটির নীচে ঢাকা পড়ে যায়, কীটে তা খেয়ে ফেলে, পানির অভাবে শুকিয়ে যায়, বন্যায় ভেসে যায় এবং এ ধরণের আরো ক্ষতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান কৃষক জানে তার চারাগাছ এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে না। ওগুলো বেঁচে উঠবে, বর্ধিত হবে। কৃষকটি ভীত—বিহ্বল হয় না। অস্বাভাবিক পন্থায় সেগুলোকে বর্ধিত করাতে চায় না। ইসলামের পথও এটাই। সুস্থিরতা ইসলামের ভূষণ। ধীরে-সুস্থে মানুষের মনোজগতে চলে তার অভিযান।

মানব রচিত মতবাদের অনুসারীরা মানুষের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। বিচক্ষণ মানুষের মন তাই কেঁদে উঠছে। ওই মানুষগুলো সোচ্চার। তারা ভয়াবহ পরিণতির সতর্কবাণী শোনাচ্ছেন।

ইসলাম মাত্র কিছু দিনের জন্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এটা সত্য নয়। কিছুলোক চাতুর্যের সাথে এ অপপ্রচার চালাচ্ছে। অর্ধ-শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত সময়ে এ মহান ও অনন্য বিধান যে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়েছিলো এক হাজার বছরেরও বেশীকাল ধরে তা টিকেছিলো। টিকেছিলো অনেক সমালোচনা ও আক্রমণ প্রতিহত করে। পৃথিবীর সব জাহেলী শক্তি তার ভিত্তিমূলে আঘাতের পর আঘাত হেনেছে। কখনো তারা একে ধ্বংস করতে পারেনি। কিন্তু ইসলামের মূলোৎপাটনের প্রচেষ্টা চলতেই থাকলো। অনেকেই এদিকে মনোযোগ দিলো। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এর ক্ষতি সাধনের কাজ করতে থাকলো। তারপর এর মূলে ক্ষয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো। একটু একটু করে একে নীতিচ্যুত করতে পারলো। এবং শেষ পর্যায়ে এসে এর বুনিয়াদকে দুর্বল করে দিতে সক্ষম হলো।

তবুও আজ পর্যন্ত ইসলামের তাত্বিক বুনিয়াদ অক্ষত—অবিকৃত। এ তাত্বিক বুনিয়াদ আজো সুলভ। একে আজ নতুনভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। একে গ্রহণ করার জন্য একটা মানব জেনারেশনকে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামের ইতিহাসের সে সোনালী যুগ—গোটা মানব জাতির জীবনে সর্বোত্তম কাল—আজো অতুলনীয় গৌরব নিয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে। এখনো

অনেক চোখ সেদিকে ধাবিত হয়। এখনো অনেক মন আন্দোলিত হয় সে যুগের ইতিহাস স্মরণ করে। সে সোনালী যুগের বিস্তৃতি অনেক নয়, তা ঠিক। কিন্তু ওই টুকুই ইসলামের ইতিহাসের সবটুকু নয়। ওই যুগটা আল্লার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত একটা আলোর মিনার, যেখানে পৌঁছার জন্য মানুষ প্রচেষ্টা চালাবে। ওই যুগটা মানুষকে নতুন আশায় আশ্বাম্বিত করে। সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করার স্বপ্ন-সাধ জাগায় মানুষের মনে। ওই যুগটা শ্রেষ্ঠ। অতি উন্নত। মানুষের জন্য দিশারী।

নিবেদিত প্রাণ একদল মুসলিমের ঐকান্তিক চেষ্টা-সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবে এসেছিলো ওই যুগটা। আজো যদি তেমনি ঐকান্তিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়, নতুন করে আবার সে যুগ—সে পরিবেশ—ফিরে আসতে পারে। কালের কোন অধ্যায়ে এসে এ প্রচেষ্টা সফল হবে, তা মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সাফল্য একান্তভাবেই আল্লার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

সোনালী যুগের পরও ইসলাম মানব জীবনের অনেক অনেক ক্ষেত্রে তার ভূমিকা পালন করে এসেছে। বহু শতাব্দী ধরে ইসলাম মানুষের ধ্যান-ধারণা, ইতিহাস ও পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। গোটা মানব জাতির জীবনে সে অনেক চিহ্ন অংকন করেছে। আর এ সত্যতা সম্পর্কে মানুষ যখন সচেতন হবে, তখন আবার সে ইসলামের বিজয়ের জন্য চেষ্টা সাধনা শুরু করবে।

একটি সফল পথ

ইসলামের সোনালী যুগ তার ঔজ্জ্বল্য, গৌরব ও পূর্ণত্ব নিয়ে মানব জাতির জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। মানব সভ্যতায় রেখে গেছে অনেক স্থায়ী নিদর্শন। তাই আজকের যুগের মানুষ আগের যুগের মানুষের চেয়ে ইসলামী সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক পর্যায়ে অবস্থান করছে। মানুষের চিন্তাধারা, মূল্যমান, সামাজিক কাঠামো ও পরিবেশের কাছে তার মূল্যবান উত্তরাধিকার বর্তমান।

অতীতের সে সোনালী যুগ সৃষ্টির পেছনে ছিল একদল আদর্শবান মানুষ। প্রাক-ইসলাম যুগে এবং পরবর্তীকালে ওই দলটির মত দ্বিতীয় আরেকটি দল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁদের তুলনায় অন্যদের গৌরব, মর্যাদা ও সাফল্য সামান্য বলে মনে হয়। তাঁরা কালের সংক্ষিপ্ত পরিসরে গড়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় গুটিকয়েক ছিলেন না, ছিলেন অনেক। এত অল্প সময়ে এত বিপুল সংখ্যক আদর্শ মানুষ কি করে তৈরী হলো, এ কথা ভেবে ঐতিহাসিকরা অবাক। তাঁদের মহত্ব ও পূর্ণত্ব মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ইসলামের অনন্য প্রভাবকে স্বীকার না করলে ইতিহাস এত সংখ্যক মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এঁরা সবাই ছিলেন মানুষ। তাঁরা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি বিবর্জিত ছিলেন না। তাঁরা তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে পদদলিত করেন নি। আবার শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্তও কিছু করেন নি। তাঁরা মানবিক সব কাজেই অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁদের যুগ ও পরিবেশের সব বৈধ আমোদ-প্রমোদও উপভোগ করতেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁরা সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। আবার কখনো কখনো ভুলও করেছেন। তাঁরা হোঁচট খেয়ে পড়েছেন,

আবার উঠেও দাঁড়িয়েছেন। আর অন্য মানুষের মত কোন কোন সময় মানবিক দুর্বলতার শিকার হয়েছেন। আবার এসব দুর্বলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ীও হয়েছেন।

এ ছিল সে দলটির বাস্তব চিত্র। এ বাস্তব সত্যের উপলব্ধি মানুষের ভুল ভাংগায়। নতুনভাবে সংগ্রাম শুরু করতে উৎসাহ দেয়। এটা মানুষকে আত্ম-প্রত্যয়ে বলীয়ান করে। আস্থাশীল করে তোলে স্থায়ী শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি। অতীতে মানুষ সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহন করেছিল মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ পথ অনুসরণ করে। মানবিক শক্তি-সামর্থ্যের ভিত্তিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে।

ওই মহান অসাধারণ মানব মণ্ডলী গড়ে উঠেছিলেন দারিদ্র্য-নিপীড়িত আরব মরুর বুকে। নৈসর্গিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উপকরণের দিক থেকে দেশটা ছিল অনুন্নত। ওই পরিবেশটা যদি এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী একটা দল গড়ে উঠার জন্য বাধা না হয়ে থাকে, তাহলে আজকের বা আগামী দিনের পরিবেশেও মানুষ তেমনিভাবে গড়ে উঠতে পারবে। অব-তীর্ণ জীবন বিধানকে গ্রহণ করে অগ্রসর হলে তাদের চেষ্টা-সাধনা আবারো সফলতা অর্জন করতে পারবে।

শত বিচ্যুতি, বিরোধিতা এবং আক্রমণের মুখেও ইসলাম সব যুগেই কিছু কিছু মহান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে এসেছে। এঁরা ছিলেন সোনালী যুগের মানুষ-গুলোর ঢংয়ে গড়া। এ মহান ব্যক্তিদের দ্বারা ইসলাম অব্যাহত গতিতে মানুষের জীবন ও ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করে এসেছে। মানব জীবন ও সভ্যতায় সে প্রভাব সুস্পষ্ট।

পথের বন্ধুরতা উপেক্ষা করে নিষ্ঠার সাথে যে ব্যক্তি ইসলামকে জীবনে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চালায়, ইসলাম আজো তাকে আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলে। এর গূঢ় রহস্য হলো ঃ এর সাথে মানব-প্রকৃতির রয়েছে একটা স্বাভাবিক মিল। এ মিল প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই মানুষের সব সুপ্ত প্রতিভা ও শক্তি-সম্পদ সক্রিয় হয়ে উঠে। মানব প্রকৃতির সুপ্ত উপকরণগুলো উল্লেখযোগ্য, পরিমিত এবং স্থায়ী। এরা যখন ইসলামের সংস্পর্শে আসে তখন সম্পদের এক প্রবাহ সৃষ্টি হয়। তখন গুপ্ত প্রাচুর্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ইসলামের সোনালী যুগ বিশ্ব-মানবতার জন্য জ্ঞানময় নীতি, ধ্যান-ধারণা ও মূল্যমান প্রতিষ্ঠা করেছিল। এগুলো ছিল অতি ব্যাপক। মানব সভ্যতার কোন স্তরে এমন মূল্যমানের প্রতিষ্ঠা আর কোনদিন দেখা যায়নি। মানুষের নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা এবং সত্যপ্রিয়তার এমন উদাহরণও আর নেই। ইসলামের মূল্যমান গোটা জীবনকে ঘিরে ফেলেছিল। জীবনের সব ক্ষেত্রেই সেগুলো সোচ্চার ছিল। আল্লার ধারণা, আল্লার সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানব জীবনের উদ্দেশ্য, জীবন সত্বার তাৎপর্য এবং বিশ্ব-অস্তিত্বের সাথে মানুষের সম্পর্ক—এ সব কিছুর ধারণা ওই মূল্যমান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। মানুষের সৃষ্টি, তার অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিপালক ও অপরাপর মানুষের সাথে তার সম্পর্ক-নীতি ইত্যাদি ইসলাম বিশদভাবে বিবৃত করেছে। বিবৃত করেছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ। জীবনের কোন দিক সম্পর্কেই ইসলাম নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেনি। সব ক্ষেত্রেই তার বক্তব্য সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে রেখেছে।

এতসব ক্রিয়াকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে একটা প্রতিকূল পরিবেশে। সে পরিবেশের ধ্যান-ধারণা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক রীতিনীতি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। ইসলামী আদর্শবাদের বিস্তৃতির পক্ষে সে পরিবেশ ছিল একটা বড় বাধা। এ প্রতিকূল পরিবেশে ইসলাম তার সাফল্যের জন্য বেছে নিল ভিন্ন বুনিয়াদ। সেটা ছিল মানব-প্রকৃতি। মানব-প্রকৃতির সুপ্ত শক্তিকে সে ক্রিয়াশীল করে তুললো। কালো মেঘের আড়াল থেকে তাকে বের করে আনলো। নিশ্চয়ই তখন মানব-প্রকৃতি শক্তিধররূপে আত্মপ্রকাশ করে যখন সে স্বাভাবিক ও নির্ভুল পথে চলার সুযোগ পায়। সে তখন পথের প্রতিকূলতাকে বীরদর্পে মাড়িয়ে চলে। ইসলাম একদিকে পরিবেশ-প্রতিকূলতাকে হিসেবের বাইরে রাখে না, অপর দিকে এর কাছে আত্মসমর্পণও করে না। ইসলাম পরিবেশ-প্রতিকূলতাকে অনতিক্রম্য অন্তরায় বলে মনে করে না। পরিবেশ-প্রতিকূলতা পথ থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য ইসলাম মানব-প্রকৃতির সামর্থ্যকেই নিয়োজিত করে। মানব-প্রকৃতির ক্রমাগত আক্রমণে প্রতিকূল পরিবেশ বিজিত হয়। অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠে। এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল অতীতের আরবে। ঘটেছিল অন্যত্রও।

কোন কোন দিক দিয়ে আজকের মানুষ ইসলামী সমাজ গঠনের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক পর্যায়ে অবস্থান করছে। সাম্প্রতিক কালে মানুষ অনেক সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করেছে। পাপ-পঙ্কিলতা, বিকৃতি-বিচ্যুতি, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মানব-প্রকৃতি মরে পচে গলে যায় নি। পুনরুত্থিত হবার এবং কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা এখনো তার আছে। এ ক্ষমতা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে তখন যখন ইসলাম তাকে বন্ধন-মুক্ত করে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে—ধাবিত করে সে পথে যেখানে এসে মানব-প্রকৃতি সৃষ্টির মৌলিক প্রকৃতির সাথে মিল খুঁজে পায়। মানব-প্রকৃতির এ ক্ষমতা পরিবেশের বাস্তবতার চেয়ে বেশী শক্তিশালী।

কারো কারো কাছে বাস্তব পরিবেশ অপরিবর্তনীয় ও সর্বশক্তিমান বলে মনে হয়। এটা একটা বাড়াবাড়ি। বড়ো রকমের বিভ্রান্তি। মানব-প্রকৃতিও তো শক্তিশালী। বাইরের অবাঞ্ছিত পরিবেশের সাথে তার লড়াই। এ লড়াইয়ে মানব-প্রকৃতি প্রাথমিক পর্যায়ে পরাজিত হতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় মানব-প্রকৃতির পক্ষেই আসে যদি সে সত্যিকার অর্থে অবতীর্ণ জীবন বিধানের নির্দেশিত পথে এগুতে থাকে।

এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। পেয়েছি সেদিন যেদিন আরব উপদ্বীপ ও গোটা পৃথিবীর বাস্তব পরিবেশ আর আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসারীরা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। মানব-প্রকৃতি সেদিন পরিবেশের বুদ্ধি-বৃত্তিক ভিত্তিসমূহের পরিবর্তন সাধন করেছিল এবং পরিবেশের নতুন বুনিয়াদ গড়েছিল। অসাধারণ বা অলৌকিক কোন পন্থায় এটা হয়নি। এটা ঘটেছিল শাশ্বত নিয়মে—মানবিক চেষ্টা-সাধনার ফলশ্রুতি হিসেবে। এ ঘটনা একবারই ঘটেছে আর ঘটবে না, এমন ধারণা করার কারণ নেই। একবার যা ঘটেছে, ঘটতে পেরেছে তা আবারও ঘটতে পারে, এটাই স্বাভাবিক। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল যুগের উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য, মানব-সভ্যতার ওপর তার প্রভাব এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতা নতুন সংগ্রামের জন্য সহায়ক উপকরণ। সোনালী যুগ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও মূল্যমানের ভিত্তিতে যে সব বাস্তবমুখীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম কায়েম করেছিল সেগুলো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সেগুলো সম্প্রসারণশীল একটা স্রোতের মতো পৃথিবীর

আনাচে কানাচে বিস্তৃত হয়েছিল। ওগুলো কোন না কোন প্রকারে মানুষের জীবন প্রভাবিত করেছিল এবং এক হাজার বছরের বেশীকাল ধরে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছিল। সভ্যতার সব দিকেই তার প্রভাব ছিল। একটা প্লাবনের মত সে প্রভাব একটার পর একটা যুগ অতিক্রম করে এসেছে। তাকে প্রতিহত করার সব প্রচেষ্টা ঠেলে দূরে সরিয়ে সম্মুখে এগিয়ে এসেছে।

মানব জাতির জীবনে এমন বহু নীতি, মূল্যমান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত আছে যেগুলোর উৎস আজকের মানুষের অজানা। কেউ কেউ ওগুলোর উৎস ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মনে করে। কিন্তু প্রকৃত উৎস খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। অসম্ভব নয় আল্লাহ প্রদত্ত পথের দিকে মানুষের ফিরে আসা।

আজকের মানুষ ইসলামকে বুঝার কাছাকাছি স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। ইসলামের প্রথম জোয়ারের সফলতার অবগতি তার ঘটেছে। ইসলাম হতে দূরে সরার পরিণতিও সে ভোগ করেছে। বর্তমান যুগের মানুষের লাঞ্ছনা, দুর্ভোগ, অশান্তিও তার দেখা। আর সে জন্যই আশা করা যায় মানুষ অচিরেই ইসলামকে গ্রহণ করবে। আগামী দিনের ইসলাম প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রামে ছবর অবলম্বন করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

সম্ভাবনাময় মানব-প্রকৃতি

অবতীর্ণ হয়েই ইসলাম আরব উপদ্বীপ এবং গোটা পৃথিবীর প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার সম্মুখীন হলো। প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, মূল্যমান নিয়ম-কানুন ইত্যাদি তাকে প্রতিহত করতে চাইলো। আরব ও গোটা পৃথিবীর পরিবেশ আর ইসলাম—এ দু'টোর মাঝে বিরাজ করছিল বিরাট ব্যবধান। বহু শতাব্দীর পুঞ্জিভূত ঐতিহাসিক বাস্তবতা, কায়েমী স্বার্থ এবং বিভিন্ন শক্তি এ নব অবতীর্ণ বিধানের পথে বাধার প্রাচীব দাঁড় করালো। এ অবতীর্ণ বিধান মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, মূল্যমান, নিয়ম-কানুন এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত হলো না। সংগে সংগে চাইলো সমাজ-কাঠামো, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন সম্পদ-বণ্টন ও জীবন যাত্রা পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তন। জাহেলিয়াত ও জুলুম-নির্যাতন হতে মানবতাকে মুক্ত করে আল্লার হাতে সোপর্দ করতে চাইলো। সেদিনের কোন নিরপেক্ষ মানুষকে যদি বলা যেতো যে, সব প্রতিকূলতা ও বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলা করে অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম বিজয় গৌরব অর্জন করবে, সে নিশ্চয়ই তা অবিশ্বাস করতো এবং বিদ্রূপের হাসি হাসতো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাস্তব পরিবেশ-প্রতিকূলতা পিছু হটে গেল। নতুন হাতে নেতৃত্ব এসে গেল। আল্লার আইনানুসারে মানব সমাজ গড়ে তোলে অন্ধকারের পরিবর্তে আলোর দিকে মানুষকে আহ্বান করা হলো। পরিবেশের প্রতিকূলতা যার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবলো কি করে একজন লোক

—মুহম্মদ (স)—কোরাইশ সর্দারদের সামনে দাঁড়াতে পারলেন? কি করে তিনি গোটা আরব ও বিশ্বের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন? কি করে তিনি প্রচলিত মন-মানসিকতা, মূল্যমান ও সমাজের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং বিজয়ী হলেন? কি করেই বা সব কিছুর আমূল পরিবর্তন এনে গড়ে তুললেন নতুন সমাজ?

তিনি প্রতিপক্ষের বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার প্রতি তোষামোদী মনোভাব দেখাননি। প্রতিপক্ষের নেতৃত্বের সাথে সমঝোতা করেন নি। নিজের পজিশন রক্ষার জন্য আত্ম মর্যাদা বিসর্জন দেন নি। তাঁকে বলা হলোঃ "বল, ওহে অবিশ্বাসীরা, তোমরা যে সবের পূজা কর আমি তাদের পূজা করি না। আমি যার পূজা করি তোমরা তার পূজা কর না। তোমরা যে সবের পূজা করলে আমি সে সবের পূজা করতে প্রস্তুত নই। আমি যার পূজা করি তোমরা তার পূজা করতেও প্রস্তুত নও। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আর আমার জন্য আমার দ্বীন।"

প্রতিপক্ষের দ্বীনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণাই কেবল এটা ছিল না। এটা ছিল ভবিষ্যতেও কোন সমঝোতার আশা না করার সুস্পষ্ট ঘোষণা। তিনি বললেনঃ "তোমরা যে সবের পূজা করলে, আমি সে সবের পূজা করতে প্রস্তুত নই।" প্রতিপক্ষের সাথে তাঁর যে একটা স্থায়ী ও অনতিক্রম্য দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল তার ঘোষণা দেয়া হলো এভাবেঃ "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন। আমার জন্য আমার দ্বীন।"

আল্লার রসূল কোন অলৌকিক শক্তি দিয়ে বিরুদ্ধ দলকে বিহ্বল করতে চাননি। অতি-মানবিক শক্তি দিয়ে তাদেরকে দিশেহারা করতে চেষ্টা করেন নি। তাঁর প্রতি আল্লার আদেশ হলোঃ "বল, আমি এ দাবী করছি না যে আল্লার ভাণ্ডার আমার হাতে। অথবা আমি দাবী করি না ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়সমূহের জ্ঞান। আমি বলি না যে আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধু তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে অবতীর্ণ হয়।"

বিজয় লাভের পর উচ্চপদ বা প্রভূত সম্পদ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লার রসূল কাউকে এ পথে আসতে উৎসাহ যোগান নি। ইবনে ইসহাক বলেনঃ 'বিশ্বনবী (স) হজ্বের সময় বিভিন্ন গোত্রকে ডেকে বলেছিলেন, "ওহে অমুক

গোত্রের লোক, আমি আল্লার রসূল। আমি এ নির্দেশ শুনাবার জন্য প্রেরিত যে তোমরা আল্লার ইবাদত কর। শিরক করো না। পৌত্তলিকতা ত্যাগ কর আমার প্রতি ঈমান আন। আমার সহযোগিতা কর যেন আমি অবতীর্ণ বাণী ঘোষণা করতে পারি।" ইবনে ইসহাক আরো বলেন ঃ "আমি আজ্‌জাহ্‌রী হতে জেনেছি যে একবার রসূলুল্লাহ (স) বনূ আমীর বিন সা'সা' গোত্রের কাছে গেলেন। তাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লার আনুগত্য করতে বললেন। বায়হারা বিন ফিরাস নামে সে গোত্রের একজন লোক ছিল। সে বললো ঃ আল্লার শপথ, কোরাইশদের মধ্য থেকে আমি যদি এ লোকটাকে পাই তাহলে তাঁর সাহায্যে আমি আরবদেরকে গিলে ফেলব। সে রসূলুল্লাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আমরা যদি আপনার আনুগত্য করি এবং দুশমনদের ওপর যদি আপনি বিজয়ী হন, তাহলে আপনার পরে কি আমরা আধিপত্য পাবো? রসূলুল্লাহ্ বলেন ঃ আধিপত্যের মালিক আল্লাহ্। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তিনি তা রাখেন। সে তখন বললো ঃ আপনি কি চান আমরা আপনার সাথী হয়ে আরবদের বিরুদ্ধে লড়ি এবং আল্লাহ্ যখন আপনাকে বিজয়ী করবেন, ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবে না? তাহলে আপনার সাথী হয়ে আমাদের লাভ নেই। তারপর তাঁরা রসূলুল্লাকে পরিত্যাগ করলো।"

তাহলে মিশন কিভাবে জয়ী হলো? পরিবেশ-প্রতিকূলতার ওপর একজন মাত্র মানুষ কিভাবে বিজয়ী হলেন? এ কাজ আল্লার রসূল অলৌকিক শক্তি দ্বারা সম্পন্ন করেননি। অলৌকিক পদ্ধতিতে তিনি তাঁর মিশন সার্থক করতে চাননি। এমন এক পদ্ধতিতে তিনি কাজটা সমাধা করলেন, যে পদ্ধতি সব মানুষই অবলম্বন করতে পারে।

অবতীর্ণ জীবন বিধানের সাথে মানব-প্রকৃতির সংগতি রয়েছে। মানব-প্রকৃতি সম্ভাবনাময়। এর সুপ্ত সামর্থ্য অসাধারণ। এ সামর্থ্যকে মুক্ত করে, একীভূত করে কোন লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করলে সে প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করে। মামুলী কোন আবরণ আর তাকে ঢেকে রাখতে পারেনা।

প্রাক-ইসলাম যুগে বিকৃত ও ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষকে দাসে পরিণত করেছিল। মিথ্যা খোদারা কা'বার অঙ্গন ও মানুষের মনে জমে উঠেছিল। গোত্রীয় ও অর্থনৈতিক স্বার্থ এ সব মিথ্যা খোদাকে ভর করে গড়ে উঠেছিল।

এদের পেছনে ছিল কা'বা ঘরের অভিভাবক ও ভণ্ড ভবিষ্যৎ-বক্তার দল। আল্লার গুণাবলী মানুষের প্রতি আরোপ করা হচ্ছিল। কা'বার অভিভাবক ও ভবিষ্যত বক্তারা মানুষের জন্য জীবন বিধান নির্ধারণের অধিকার ভোগ করেছিল। ইসলাম এলো একত্ববাদ নিয়ে। ইসলাম মানব-প্রকৃতিকে আহ্বান জানলো। সে আহ্বান আবেদন সৃষ্টি করলো। ইসলাম মানব-প্রকৃতি এবং মানব গোষ্ঠির সামনে এক আল্লার যথার্থ পরিচিতি তুলে ধরলো। "বল: আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কি আমি পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করবো, যিনি আসমান ও পৃথিবীর স্রষ্টা, যিনি সবাইকে খাওয়ান কিন্তু নিজে খান না? বল: আমাকে তো এ আদেশই করা হয়েছে যেন সকলের আগে আমিই আত্মসমর্পী হই। আমাকে তাকিদ করা হয়েছে: তুমি কিছুতেই মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না। বল: নিশ্চয়ই আমি প্রভুর বিদ্রোহী হতে ভয় করি, ভয় করি বিচার-দিনের ভয়ঙ্কর শাস্তির। সে দিন যে ব্যক্তি শাস্তি হতে রেহাই পেল, সে তো আল্লার অশেষ অনুগ্রহ লাভ করলো। এ হচ্ছে সুস্পষ্ট সাফল্য। আল্লাহ যদি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করেন, তবে তিনি ছাড়া তোমাকে এ ক্ষতি হতে রক্ষা করবে, এমন কেউ নেই। আর তিনি যদি কল্যাণ করতে চান, তবে তিনি তো সর্বশক্তিমান। তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মহাজ্ঞানী ও সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। তাদের জিজ্ঞেস কর কার সাক্ষ্য সবচেয় বেশী গণ্য। বল: আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাই হচ্ছেন সাক্ষী। এ কোরআন আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে ও অন্যান্যদেরকে সতর্ক ও সাবধান করে দিই। তোমরা কি বাস্তবিকই এ সাক্ষ্য দান করতে পার যে আল্লার সাথে আরো কোন ইলাহ আছে? বল: আমি তো এমন সাক্ষ্য কিছুতেই দিতে পারি না। বল: আল্লাহ তো সে এক-ই। তোমরা যে শিরক বিশ্বাসে লিপ্ত, আমি তার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন।"—আল আনয়াম।

"বল: তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদেরই পূজা-উপাসনা কর, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বল: আমি তোমাদের

৩—

ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করবো না। এরূপ করলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব, সৎ পথের পথিক হতে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল থাকতে পারবোনা। বল ঃ আমি আমার আল্লার নিকট হতে প্রাপ্ত এক উজ্জ্বল প্রমা-নের ওপর প্রতিষ্টিত, অথচ তোমরা তা অবিশ্বাস করলে। সে জিনিস আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই, যা তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও। হুকুম প্রদানের সব ইখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লার। তিনিই সত্য কথা বর্ণনা করেন। তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী। বল ঃ সে জিনিস যদি আমার ইখতিয়ারে থাকতো যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাও, তাহলে তোমাদের ও আমার মধ্যে কবেই না ফয়সালা হয়ে যেতো। কিন্তু জালেমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তা আল্লাই ভাল জানেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের চাবিকাঠি তাঁরই নিকটে ; তিনি ছাড়া আর কেউ জানেনা। স্থলভাগ ও পানিতে যা কিছু আছে, তিনি তার সব কিছুই জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না। জমির অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই যার সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। আর্দ্র ও শুষ্ক জিনিস সব কিছুই এক উন্মুক্ত কিতাবে লিখিত রয়েছে। তিনি রাত্রিবেলা তোমাদের রূহ কবজ করেন। আর দিনের বেলা তোমরা যা কিছু কর, তা তিনি জানেন। তারপর দ্বিতীয় দিন তিনি তোমাদেরকে সে কর্মজগতে ফিরিয়ে পাঠান, যেন জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হতে পারে। কেননা শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকটে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কি কাজ করেছো তা তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন। তাঁর বান্দাদের ওপর তিনি পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। তিনি তোমাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠান। এমন কি তোমাদের কারো মৃত্যুক্ষণ যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁর প্রেরিত ফিরিশতা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজ কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। অতঃপর প্রত্যেকেই স্বীয় প্রভু ও মা'বুদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। সাবধান থেকো, ফয়সালা করার—সিদ্ধান্ত গ্রহণের সব ইখতিয়ার কেবল তাঁরই। হিসাব গ্রহণে তিনি পূর্ণমাত্রায় ক্ষম-তাশালী। এদের জিজ্ঞেস কর, মরু-প্রান্তর এবং নদী-সমুদ্রের জমাট অন্ধকারে তোমাদেরকে বিপদ হতে রক্ষা করেন কে ? কার সামনে বিপদকালে কাতর-কণ্ঠে ও চুপি চুপি প্রার্থনা ও দোয়া করতে থাক ? কাকে বল যে তোমাদেরকে

বিপদ হতে রক্ষা করলে তোমরা অবশ্যই শোকের গুজার বান্দাহ হবে? বল: আল্লাই তোমাদেরকে তা হতে মুক্তি দান করেন। তাহলে তোমরা অন্য কাউকে তাঁর শরীক মনে করছো কেন? বল: তিনি তোমাদের ওপর উর্ধ্বলোক হতে কিংবা তোমাদের পদতল হতে কোন আজাব পাঠাতে সক্ষম অথবা তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একদল দ্বারা অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। দেখ, আমরা কিভাবে বারে বারে বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের বণ্টনসমূহ তাদের সম্মুখে পেশ করছি। সম্ভবতঃ তারা এ নিগূঢ় কথা বুঝতে সক্ষম হবে"—আল আন্‌য়াম।

মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি পারিপার্শ্বিকতার বাস্তব অবস্থায় বিরাজ করে এ আওয়াজ শুনতে পেল। পরিণামে সে তার এক ও সত্য প্রভুর দিকে ফিরে এল। এ নতুন আহ্বান পারিপার্শ্বিকতার রূঢ় বাস্তবতাকে হার মানালো।

মানুষ যখন আল্লার দিকে ফিরে এল, মানুষের পক্ষে অপর মানুষের ইবা-দত করা তখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। একজন মানুষ অপরজনের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। সকলের মাথা নত হলো শুধু মাত্র মহাশক্তিশালী আল্লার প্রতি। আভিজাত্য, গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য ও রাজতন্ত্র—সব শেষ হয়ে গেল।

আরব উপদ্বীপ ও পৃথিবী জুড়ে গোত্রীয়, শ্রেণীগত, কায়েমী স্বার্থ, বস্তুগত ও বুদ্ধিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটা ছিল বাস্তব সামাজিক পরিবেশ। কেউ এ পরিবেশের বিরোধিতা করতে সাহস পাচ্ছিলনা। যারা এ পরিবেশে লাভ-বান হচ্ছিল, তারা স্বাভাবিকভাবেই এর বিরোধিতা করেনি। অপর দিকে যারা এর দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছিল, বিরোধিতা করার হিম্মত তাদের ছিলনা।

কোরাইশগণ নিজেদেরকে অভিজাত বলতো। অন্যান্য আরবদের চেয়ে তাদের ঐতিহ্য ও অধিকার বেশী রয়েছে বলে মনে করতো। হজ্জের সময় সবাই যখন আরাফাতে জমা হতো তারা তখন মুজদালিফা-তে অবস্থান করতো। এ বিশেষ সুবিধা ভোগের কারণে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা অন্যদের চেয়ে বেশী লাভবান হতো। কোরাইশদের কাছ থেকে কেনা পরিধেয় না পরে কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করা নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য খালি গায়ে এ কাজের অনুমতি ছিল। কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে কেনা পরিধেয় পরে কা'বা প্রদক্ষিণের

অনুমতি দেয়া হতো না। আরবের বাইরের জগতও তখন বংশীয় আভিজাত্য ও গোত্রীয় ভেদাভেদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে কোঁকাচ্ছিল।

ইরানের সমাজ বংশীয় ও পেশাভিত্তিক ভেদ-নীতিতে দুষ্ট ছিল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একটা দুর্লংঘ্য দূরত্ব বিরাজ করছিল। রাষ্ট্রীয় আইনে সাধারণ মানুষ কর্তৃক অভিজাত শ্রেণীর সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার নিষিদ্ধ ছিল। সাসানী আমলের একটা বিধি ছিল যে, জন্মগতভাবে কোন ব্যক্তি যে অবস্থা পেয়েছে সে অবস্থাতেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং সে এর বেশী কিছু চাইতে বা পেতে পারবে না। ইরানের বাদশাগণ কোনদিন কোন মহান দায়িত্ব পালনের অধিকার সাধারণ পরিবারের কোন সন্তানকে দেয়নি। সাধারণ মানুষ আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং বিশেষ শ্রেণীর জন্য সামাজিক পজিশন নির্দিষ্ট ছিল। ইরানের বাদশাগণ দাবী করতো যে তাদের ধমনীতে স্বর্গীয় রক্ত প্রবাহিত। ইরানের জনগণ এদেরকে দেবতা জ্ঞান করতো এবং বিশ্বাস করতো যে এদের প্রকৃতিতে স্বর্গীয় কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। তারা পাপ হতে মুক্তির জন্য এদের কাছে প্রার্থনা জানাতো, এদের গুণকীর্তন করতো। এদেরকে আইনও সমালোচনার উর্ধে মনে করতো। তারা এদের নামোচ্চারণ করতো না এবং এদের মজলিশে উপবেশন করতোনা। তারা মনে করতো অন্যদের সব কিছুতেই এদের দাবী আছে। কিন্তু অন্য কারো কোন দাবী এদের কাছে নেই। এদের প্রাচুর্যের ভাণ্ডার হতে সামান্য দানকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করা হতো। কায়ানী বংশ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা হতো যে মুকুট ধারণ এবং কর আদায়ের অধিকার এদের ছাড়া আর কারো নেই। এ অধিকার পৈত্রিক সূত্রে অর্জিত হতো। বংশের মধ্যে কোন বয়স্ক উত্তরাধিকারী না পাওয়া গেলে কম বয়স্ক উত্তরাধিকারীকেই সিংহাসনে বসানো হতো। পুরুষ না পাওয়া গেলে স্ত্রীলোককে বসানো হতো। শিরভেহ-এর পর তার পুত্র আর্দেশির মাত্র সাত বছর বয়সে ইরানীদের ভাগ্য-বিধাতার আসনে বসে। খসরু পারভেজ-এর পুত্র ফররুখজাদ খসরু অল্প বয়সে সিংহাসনে আরোহন করে। খসরুর এক কন্যাকে শাসনকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত করা হলো। রাজবংশের লোক না হওয়ার কারণে খ্যাতনামা বীর ও সেনানায়ক রুস্তম শাসনদণ্ড হাতে নেবার অধিকারী ছিলেন না।

ভারতের বর্ণ-ব্যবস্থা অতি জঘন্য ছিল। ঈসা (আ)-এর তিন শতাব্দী পূর্বে ভারতে ব্রাহ্মণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনুশাস্ত্র প্রবর্তিত ছিল। এ শাস্ত্র বলে মানুষকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হলো। প্রথম শ্রেণীতে ছিল ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল ক্ষত্রীয়। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল বৈশ্য আর চতুর্থ শ্রেণীতে শুদ্র। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করতো। বৈশ্যরা ছিল কৃষি-পণ্য উৎপাদক ও ব্যবসায়ী। শূদ্ররা ছিল দাস ও শ্রমিকশ্রেণী। এ শাস্ত্রের প্রণেতা মনু বলেন: "সর্বশক্তিমান পৃথিবীর স্বার্থে ব্রাহ্মণকে তাঁর মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়কে তাঁর উরু থেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন করেছেন। ব্রাহ্মণ বেদের শিক্ষা দেবে, পূজা পরিচালনা করবে এবং দান বণ্টন করবে। ক্ষত্রিয় জনগণের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত থাকবে, পূজা দেবে, বেদ পড়বে এবং প্রবৃত্তি দমন করবে। বৈশ্য পশু পালন করবে, বেদ পড়বে এবং কৃষি ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকবে। শুদ্র শুধু অন্য তিনটে শ্রেণীর সেবা করবে।"

এ আইন ব্রাহ্মণকে এমন সব সুবিধা ও অধিকার দিল যে, তাকে প্রায় দেবতার মর্যাদা দেয়া হলো। তাদেরকে স্রষ্টার বাছাইকৃত ব্যক্তি এবং সৃষ্টির সেরা আখ্যা দেয়া হলো। পৃথিবীর সব কিছু ছিল তাদের সম্পদ। তাদেরকে সৃষ্টির পরিচালক ও মনিব-শ্রেণী মনে করা হতো। শূদ্রদের কাছ থেকে তারা যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করতে পারতো। কারণ দাসের তো কিছু থাকে না। তার সবই তো মনিবের।

বলা হলো, যে ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদ মুখস্থ করবে তার সব পাপ মাফ হয়ে যাবে। দেশের রাজা কোন অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের অধিকার ও সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কোন ব্রাহ্মণকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেয়া যাবে না। ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের নীচে। মনু বলেন: "দশ বছরের ব্রাহ্মণও একশো বছরের ক্ষত্রিয় থেকে উত্তম। যেমনি করে পিতা তার পুত্র থেকে শ্রেষ্ঠ।" অস্পৃশ্য শূদ্রের অবস্থা ইতর প্রাণীর অবস্থার চেয়ে উন্নত ছিল না। মনু বলেন: ব্রাহ্মণদের সেবা করাতেই শূদ্রের সন্তোষ। এর জন্য কোন মজুরী বা পুরস্কারের প্রয়োজন নেই। তারা সম্পদ সংগ্রহ ও মওজুদ করবে না। কারণ এতে ব্রাহ্মণ দুঃখ পাবেন। কোন শুদ্র যদি কোন ব্রাহ্মণকে আঘাত করতে হাত বাড়ায়, তবে শাস্তি হিসেবে তার হাত কাটা হবে। রাগের অবস্থায় সে যদি কোন

ব্রাহ্মণকে লাথি মেরে থাকে, হবে তার পা কাটা হবে। যদি ব্রাহ্মণের সাথে বসে, রাজা তাকে দেশান্তরে পাঠাবেন। কোন ব্রাহ্মণকে গালি দিলে তার জিহ্বা উপড়িয়ে ফেলা হবে। সে যদি কোন ব্রাহ্মণের সাথে পরিচিত বলে দাবী করে, তাহলে তাকে গরম তৈল পান করানো হবে। কোন শূদ্র নিহত হলে তার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ একটা কুকুর বা বিড়াল হত্যার ক্ষতিপূরণের সমান হবে।"

সুখ্যাত রোমানদের কথায় আসা যাক। দেশের জনগণের একভাগ ছিল অভিজাত শ্রেণী। তিন ভাগ ছিল দাস। দাসদের শ্রম দ্বারা অভিজাত শ্রেণীর সব বিলাসিতার আয়োজন হতো। আইনের চোখেও মনিব-শ্রেণী ও দাস-শ্রেণীর পার্থক্য ছিল। জাষ্টিনিয়ানের বিধান বলে ঃ "কোন লোক যদি অভিজাত কোন বিধবা বা কুমারীকে অপহরণ করে, সে ব্যক্তি অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হলে তার শাস্তি হবে তার অর্ধেক সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি। আর সে ব্যক্তি যদি নীচু বংশের হয় তবে তাকে বেত্রাঘাত করে নির্বাসনে পাঠাতে হবে।"

এ ছিল তদানীন্তন পৃথিবীর অবস্থা। এ সময়ে ইসলাম অবতীর্ণ হলো। ইসলাম মানব-প্রকৃতির কাছে নিজেকে পেশ করলো। ইসলামের আহ্বানে মানব-প্রকৃতি সাড়া দিল। অচিরে গোটা পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে গেল।

মানব-প্রকৃতি আল্লার আহ্বান শুনলো ঃ "ওহে মানুষেরা, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারীরূপে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা সহজে একে অপরের পরিচিতি পেতে পার। নিশ্চয়ই আল্লার কাছে সবচেয়ে বেশী সম্মানিত তারা যারা তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়ার অধিকারী।" মানব-প্রকৃতি কোরাইশদের প্রতি তাঁরা আহ্বান শুনলো ঃ "তোমরাও দৌড়াও, যেখানে অন্যেরা দৌড়ায়।" সে শুনতে পেল বিশ্বনবীর বাণী ঃ "ওহে মানুষেরা, তোমাদের প্রভু একজন। তোমাদের পূর্ব পুরুষ একজন। তোমরা সবাই আদম-সন্তান। আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই অধিক সম্মানের পাত্র যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। অনারবের ওপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবের ওপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্বেতাঙ্গের ওপর অশ্বেতাঙ্গের কোন প্রাধান্য

নেই। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি পুণ্য ও আল্লার প্রতি ভয় পোষণ।" মানব-প্রকৃতি বিশ্বনবীকে কোরাইশদের বলতে শুনলো: "ওহে আবদ মানাফের বংশধরেরা, আল্লার মোকাবিলায় কিছুতেই তোমাদের লাভ নেই। ওহে আব্বাস ইবনে আবদুল মুতালিব, আল্লার মোকাবিলায় কিছুতেই তোমার লাভ নেই। মুহম্মদের কন্যা ফাতিমা, আমার সম্পদের তুমি কি চাও বল, কেননা আল্লার মোকাবিলায় কিছুতেই আমার লাভ নেই।"

মানব-প্রকৃতি এ সব আহ্বান শুনলো। সাড়া দিল স্বাভাবিক কারণেই। আর চিরন্তন নীতি অনুযায়ী এর পরিণতিও প্রকাশ পেল।

আরবে সুদ প্রথা প্রবর্তিত ছিল। অর্থনীতি সুদের ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হতো। এটা কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। কোরাইশগণ গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় এবং শীতকালে ইয়েমেনে ব্যবসা করতে যেতো। কোরাইশদের পুঁজি এ ব্যবসায়ে নিয়োজিত হতো। এ পুঁজি বিনিয়োগ, বাণিজ্যিক তৎপরতা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতো। রসূলুল্লাহ (স)-এর মিশন শুরু হওয়ার পূর্বে সব দেশের অর্থ ব্যবস্থা সুদের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিল। মদীনার ইহুদীরা তো সুদ ব্যবসার মাধ্যমে গোটা অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। এ ছিল অর্থনৈতিক বাস্তব পরিবেশ।

ইসলাম এসে এ অন্যায় ও অপরাধমূলক ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করলো। অর্থনীতির নতুন বুনিয়াদ স্থাপিত হলো। জাকাত-ব্যবস্থার প্রবর্তন হলো। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হলো। আল্লাহ বলেন: যারা নিজেদের ধন-মাল রাত্রে বা দিনে, গোপনে বা প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের প্রতিফল তাদের আল্লার নিকট প্রাপ্য রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা হয় সে ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থ-জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে: ব্যবসা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। যে ব্যক্তির নিকট আল্লার উপদেশ পৌঁছবে এবং ভবিষ্যতে এ সুদের ব্যবসা হতে বিরত থাকবে, সে পূর্বে যা কিছু খেয়েছে, তা তো খেয়েছেই—সে ব্যাপারটি

আল্লার ওপর সোপর্দ। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে, যেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ সুদকে নির্মূল করে দেন এবং দানকে ক্রমবৃদ্ধি করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ ও পাপী মানুষকে পছন্দ করেন না। তবে যারা ঈমান আনবে, সৎ কর্মশীল হবে, সালাত কায়েম করবে, জাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে তাদের প্রতিফল নিশ্চিতরূপেই আল্লার নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। ওহে ঈমানদারগণ, আল্লাকে ভয় কর। তোমাদের যে সুদ পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যি ঈমান এনে থাক। যদি তা না কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ ও রসুলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। এখনো যদি তওবা কর, তবে তো মূলধন ফিরে পাবার অধিকারী হবে। না তোমরা জুলুম করবে না তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে। তোমাদের ঋণ গৃহীতা যদি অভাব-গ্রস্তই থাকে, তবে স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবসর দাও। আর যদি দান করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণ আনবে, যদি তোমরা বুঝ, তবে সেদিনের লাঞ্ছনা ও বিপদ হতে আত্মরক্ষা কর যেদিন তোমরা আল্লার দিকে ফিরে যাবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জিত পাপ কিংবা পুণ্যের পুরোপুরি ফল দান করা হবে এবং কারো ওপর জুলুম করা হবে না।"—আল বাকারা।

মানব-প্রকৃতি অনুভব করলো সে যে অবস্থায় আছে তা থেকে আল্লার নির্দেশিত পথ উত্তম। সুদের প্রতি তার ঘৃণা সৃষ্টি হলো। গোটা পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য মানব-প্রকৃতি উৎসাহী হয়ে উঠলো। মুসলিম সমাজ জাহেলী যুগের সুদ-ব্যবস্থা বর্জন করলো। আল্লার শাশ্বত নিয়মের অধীনেই এমন বিরাট কাজ সমাধা হলো। বাতিলের কবলমুক্ত মানব-প্রকৃতি ইসলামের ছোঁয়া পেয়ে যে শক্তি অর্জন করলো তারই বলে এত বড় কাজ সম্পাদন সম্ভব হলো।

ইসলাম বাস্তব পরিবেশ-পরিস্থিতির কাছে হাত জোড় করে আত্মসমর্পণ করেনি। পরিবেশের প্রতিকূলতাকে সে পরিবর্তিত করেছে। নিজের অনন্য

সুন্দর কাঠামো অতি মজবুত বুনিয়াদের ওপর দাঁড় করিয়েছে। আর এ জন্য সে ব্যবহার করেছে মানব-প্রকৃতির সম্ভাবনাময়তাকে।

ইসলামের সোনালী যুগ অনেক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে মানব সভ্যতায় রেখে গেছে অফুরন্ত অবদান। রেখে গেছে অনেক নিদর্শন। মানবতার নব অভিযানে সেগুলো হবে অমূল্য পাথেয়।

অভিজ্ঞতা-সম্পদ

ইসলাম যখন এলো তখন প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তার কাছে ছিল শুধু সম্ভাবনাময় মানব-প্রাকৃতি। মানব-প্রকৃতি বহু শতাব্দীর জাহেলিয়াতের আবর্জনা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো এবং ইসলামের পক্ষ নিলো।

সৃষ্টি হলো একটা অপূর্ব যুগ। মানুষগুলো হলো ব্যতিক্রম ধর্মী। বাস্তব জীবনের চৌহদ্দীতে মানবিক শক্তি সামর্থ্য আল্লার ইচ্ছায় এক বিপ্লব ঘটালো। প্রতিষ্ঠিত পরিবেশের স্বাভাবিক ফসল হিসেবে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। আদর্শ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব মানব-প্রকৃতিকে পথের দিশা দিলো। শৃংখল মুক্ত মানব প্রকৃতি এ ফসল উৎপাদন করলো।

সোনালী যুগের মানুষেরা আদর্শ জীবন যাপনের সর্বোত্তম নমুনা স্থাপন করলেন। তাঁদের অল্প পরে যাঁরা আসলেন তাঁরাও তাঁদের মত সর্বোত্তম নমুনা হয়ে থাকতে পারলেন না। কারণ ইসলাম অতি দ্রুত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছিল। দলে দলে মানুষ একে গ্রহণ করছিল। কিন্তু নব দীক্ষিত মানুষগুলোকে ভালভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যাচ্ছিল না। তাঁদেরকে সুমহান রূপে গড়ে তোলার সুযোগ বেশী পাওয়া যাচ্ছিল না। এ ফাঁকে আগাছা জন্ম নিতে শুরু করলো। সাম্প্রতিক কালে বিতাড়িত জাহলিয়াতের অবশিষ্টাংশ আবার জীবিত হয়ে উঠলো এবং মানুষকে মর্যাদার উচ্চাসন থেকে নীচে নামিয়ে দিতে শুরু করলো। এ মানুষগুলো যদি সোনালী যুগের মানুষগুলোর মত পূর্ণাংগ প্রশিক্ষণ পেতেন তাহলে মুসলিম জাতির ইতিহাস

ভিন্ন ভাবে লিখতে হতো। ভিন্ন ভাবে লিখতে হতো মানব জাতির ইতিহাস।

এক হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে মুসলিম জাতি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। মুসলিম মিল্লাত পূর্ণত্বের সর্বোচ্চ স্তরে সব সময় অবস্থান করতে পারেনি। কখনো সে নীচে নেমেছে। আবার কখনো কিছুটা উপরে ওঠেছে। তার অবস্থান-স্তরগুলো অন্যান্য সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্ট মানুষ কর্তৃক অর্জিত অবস্থা থেকে উন্নততর ছিল। সততার সাথে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্য সহজেই বুঝা যায়।

অতীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং এক হাজার বছর ধরে আংশিকভাবে হলেও শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণ নিষ্ফল ছিল না। মানবেতিহাস তাকে ভুলে যায়নি। আজ মানুষ যে পৃথিবী দেখছে তাথেকে সে পৃথিবী ছিল ভিন্ন।

মহাকালের দীর্ঘ প্রবাহে আসলে বিভিন্ন যুগের মানুষ পরস্পর সম্পৃক্ত। মানব জাতির মানসিকতাও এমন যে সে অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে থাকে। জাহেলিয়াত ও বিভ্রান্তির সব বাধা ঠেলে অতীত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান স্থায়িত্বের পথে এগিয়ে এসেছে এবং সভ্যতার ওপর আলোকচ্ছটা বিকিরণ করছে।

অতীতে ইসলামী সংগ্রামের পুঁজি ছিল মানব-প্রকৃতি। আজ তার সাথে যুক্ত হয়েছে সোনালী যুগের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-সম্পদ। আল্লাকে ছেড়ে পথ চলার তিক্ত অভিজ্ঞতাও তার অর্জিত হয়েছে।

ইসলাম এসে প্রচলিত চিন্তা-ধারা, নিয়ম-কানুন ও ব্যবস্থাপনার গায়ে এক প্রচণ্ড ধাক্কা লাগালো। সে ধাক্কায় প্রচলিত সব কিছু ভেঙ্গে গেল। ইসলাম তার চিন্তা-ধারা, নিয়ম-কানুন ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তুললো। ইসলামের প্রতি-ষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা, মূল্যমান, মানদণ্ড ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্ধ-শতা-ব্দীকালের জন্য পূর্ণাংগ রূপে বিরাজমান ছিল। পরবর্তীকালে কখনো সবল, কখনো দুর্বলভাবে সারা মুসলিম জাহানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালের পরবর্তী অধ্যায়ে গোটা মানব জাতি কোন না কোন ভাবে এগুলোর কম-বেশী পরি-চিতি লাভ করলো।

এ পরিচিতির কারণেই এদের কাছে ইসলাম অবাস্তব বা আজগুবী বিধান বলে মনে হয়নি, যেমনটি মনে হয়েছিল ইসলামের সর্বপ্রথম প্রচারকালে।

সোনালী যুগের মানুষ ইসলামের যে সুষমা দেখেছিল পরবর্তীকালের মানুষ তা দেখেনি। পরবর্তীকালের মানুষেরা ইসলামকে জীবনে প্রয়োগ করতে গিয়েও এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি। আর যথার্থ মূল্যায়নের অভাব থাকলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হোচট খাবেই, বাধাগ্রস্ত হবেই। এ কথাগুলো স্বীকার করে নিয়েও আমরা বলতে বাধ্য যে গোটা মানব জাতি আজ বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে ইসলামের সত্যিকার রূপ উপলব্ধির কাছাকাছি এসে পড়েছে।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন আদর্শ। জীবনের কোন দিক এর আওতার বাইরে নেই। ইসলামের এ ব্যাপ্তি ও সার্বজনীনতা অস্বীকার করার উপায় কারো নেই। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মহান আন্দোলন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামের সার্বজনীনতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ইউরোপে লুথার ও ক্যালভিনের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, ইউরোপীয় রেনেসাঁ আন্দোলন, সামন্তবাদী ব্যবস্থার অবসান, ইংল্যাণ্ডে মানবাধিকার আন্দোলন ও ম্যাগনা কার্টা, ফরাসী বিপ্লব এবং বিজ্ঞানে জগতে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ডঃ আহমদ আমিন "দি ডন অব ইসলাম" বইতে লিখেছেন: "খৃষ্টানদের মধ্য থেকে বেশ কিছু আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ওগুলোর ওপর ইসলামের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। অষ্টম শতকে এ ধরনের আন্দোলন হয়েছিল সেপ্টিমেনিয়া-তে। এ আন্দোলন পাদ্রীর কাছে পাপের স্বীকারোক্তির নীতি বিরোধী ছিল। এ আন্দোলন দাবী জানালো যে মানুষ তার পাপের জন্য কেবল আল্লার কাছেই ক্ষমা চাইবে। ইসলামে পাদ্রী-পুরোহিত নেই। এদের কাছে পাপের স্বীকারোক্তির প্রশ্নও নেই।"

"অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে একদল খৃষ্টান ছবি ও মূর্তির পবিত্রতার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলো। রোমের সম্রাট তৃতীয় লিও ৭২৬ সালে ছবি ও প্রস্তর মূর্তির পূজা নিষিদ্ধ করে এক নির্দেশ জারী করেন। ৭৩০ খৃষ্টাব্দে এক নির্দেশে তিনি এ কাজকে আবার নিন্দা করেন। পঞ্চম কনষ্টান্টাইন ও চতুর্থ লিও প্রস্তর মূর্তির পূজার বিরোধিতা করেন। অবশ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পোপ গ্রেগরী, জার্মানিয়াস ও সম্রাজ্ঞী আইনের মূর্তি পূজা সমর্থন করেন। এ দু' গ্রুপের মধ্যে তুমুল বিবাদ হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক প্রতিকৃতি ও মূর্তি

ভাঙ্গার এ আন্দোলনকে ইসলামের প্রভাব বলেই বিবেচনা করেছেন। ক্লডিয়াস ছিলেন তুরেনের বিশপ। তিনি প্রতিকৃতি, মূর্তি ও ক্রস পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং এ গুলোর পূজা নিষিদ্ধ করেছিলেন।"

"খৃষ্টানদের মধ্যে একদল ছিল যারা ত্রিত্ববাদের বিরোধী এবং ঈসা আলাই-হিসসালামকে খোদার পুত্র বলতো না।"

একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ক্রুসেডারগণ ইসলামী প্রাচ্য থেকে ফিরে যাবার কালে মুসলিম সমাজের ছবিও মনে গেঁথে নিয়েছিল। অনেক দুর্বলতা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে তখনো এ বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল যে, দেশের শাসক ও শাসিত আইনের চোখে সমান। ইউরোপের মত আইন কোন অভিজাত ব্যক্তি বা সামন্ত প্রভুর খেয়াল-খুশী প্রসূত ছিলনা। মুসলিম সমাজে পেশা নির্বাচন ও বাসস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ছিল। বংশানুক্রমিক সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস পদ্ধতি ছিল না। সামন্তবাদী সমাজে বাস করে একজন ইউরোপীয় এ বৈশিষ্ট্য-গুলো এর আগে দেখার সুযোগ পায়নি। সে ছিল তার দেশের দাস। তার মনিবের ইচ্ছাই ছিল আইন। জন্মগতভাবে তার সামাজিক পজিশন ছিল নির্ধারিত।

ইউরোপে আন্দোলন গড়ে উঠলো। অচিরেই সামন্তবাদ নির্বাসিত হলো। ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো।

মুসলিম স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রাপ্ত শিক্ষা, ইসলামী সভ্যতার প্রভাব এবং ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনুবাদ ইউরোপীয় চিন্তাধারায় আলো-ড়ন সৃষ্টি করলো। চতুর্দশ শতাব্দী হতে পুনর্জাগরন আন্দোলন শুরু হলো। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতি গৃহীত হলো।

মিঃ ব্রিফেল্ড "দি মেকিং অব হিউম্যানিটি" বইতে লিখেছেন : আজকের দুনিয়ায় আরব সভ্যতার সর্বচেয়ে বড় অবদান হলো বিজ্ঞান। স্পেনে আরব সভ্যতার ফলে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ওই সভ্যতা বিস্মৃত হওয়ার বহু শতাব্দী পরে সে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। কেবল বিজ্ঞান-ই ইউরোপকে পুনর্জী-বিত করেনি। ইসলামী সভ্যতার অনেক কিছুই ইউরোপকে আলো দান করে-ছিল।" "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ইউরোপ পেয়েছিল মুসলিমদের কাছ থেকে।"

ব্রিফেল্ড আরো লিখেন : "আমাদের বিজ্ঞান শুধুমাত্র বিস্ময়কর আবিষ্কার বা মৌলিক থিউরীগুলোর জন্যই আরবদের কাছে ঋণী নয়। বরং সে তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কিছুর জন্য ঋণী। আর সেটা হলো তার জীবন সত্তা। প্রাচীন সমাজে বিজ্ঞান ছিল না। জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্র গ্রীকদের জন্য বিদেশী শাস্ত্র ছিল। গ্রীকরা এগুলোকে সমন্বিত করেছে এবং থিউরীর জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সচেতন অনুসন্ধান, তথ্যাবলী সংগ্রহ, বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্লেষণী মনোভাব, সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতি—এসব কিছু গ্রীক চিন্তার বাইরে ছিল। 'বিজ্ঞান' বলে যা আজ বুঝানো হয় তা ইউরোপের নতুন অনুসন্ধানী মন, গবেষণা-পর্যবেক্ষণ ও গণিত শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির ফল হিসেবে এসেছে। আর এ মানসিকতা ও গবেষণা পদ্ধতি ইউরোপে আমদানী হয়েছে আরবদের কাছ থেকে।"

তিনি লিখেন, "স্পেনের আরব বিজ্ঞানীদের উত্তরাধিকারীদের কাছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রোজার বেকন আরবী ভাষা ও আরবদের বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। না রোজার বেকনকে, না পরবর্তীকালের ফ্রান্সিস বেকনকে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দেয়া যায়। মুসলিম বিজ্ঞান ও গবেষণা পদ্ধতি ইউরোপে যাঁরা আমদানী করেছিলেন রোজার বেকন তাঁদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বার বার বলতেন যে আরবী ভাষা এবং আরবদের বিজ্ঞান-চর্চা করেই নির্ভুল জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব। পরীক্ষণ-পদ্ধতির উদ্ভাবক সম্পর্কিত ইউরোপীয় দাবী সে সভ্যতার ভিত্তিসমূহের অপব্যাখ্যার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বেকনের সমসাময়িক কালে আরবদের পরীক্ষণ পদ্ধতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল এবং গোটা ইউরোপ তা শেখার জন্য উদগ্রীব ছিল। রোজার বেকন কোত্থেকে এ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে পরিচিত হন? এ জ্ঞান তিনি পেয়েছিলেন ইসলামী স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে। তাঁর গ্রন্থ Cepus Majus-এর পঞ্চম ভাগ প্রকৃতপক্ষে ইবনে হায়সামের "আল মানাজির" গ্রন্থের নকল।"

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্রিইবার তাঁর "দি ষ্ট্রাগল বিটুইন রিলিজান এণ্ড সাইন্স" গ্রন্থে লিখেন, "মুসলিম বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে থিউর‍্যাটিক্যাল পদ্ধতি প্রগতির দিকে পরিচালনা করে না এবং সত্যের

অনুসন্ধান ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। তাই তাঁদের গবেষণা ছিল পরীক্ষণ-পদ্ধতি ভিত্তিক।

এ বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের ফল দেখা গেল তাঁদের যুগে শিল্পোন্নয়নের চমৎকারিত্বের মাঝে। তাঁদের লিখা বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলো পড়লে আমরা বিস্মিত হই এবং এগুলো এ কালে লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়। এ গুলোর মধ্যে একটা তো হলো ক্রমবিকাশবাদ যেটাকে আজকের মতবাদ বলে ভুল করা হয়। তাঁরা এ মতবাদকে আরো অনেক দূর নিয়ে গিয়েছিলেন এবং জড়-পদার্থ ও খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছিলেন। (ডারউইন ও ওয়ালেসের ক্রমবিকাশবাদ ইসলামী মতবাদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে)। তাঁরা রসায়ন শাস্ত্রকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রয়োগ করেছিলেন এবং মধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাখ্যাদানের অতি নিকটে পৌঁছেছিলেন। আলো ও দৃষ্টি শক্তি সম্পর্কে তাঁরা গ্রীকদের প্রাচীন ধারণা পাল্টাতে পেরেছিলেন। আলোর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি এবং পানি বা কাঁচে প্রবেশের সময় বক্রতা সম্পর্কে তাঁরা সুস্পষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হাসান ইবনে হায়সাম বায়ু মণ্ডলের ভেতর দিয়ে গমনকালে আলোর রক্তাংশ সৃষ্টির বিষয়টি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে দিগন্ত রেখায় আসার আগেই আমরা সূর্য ও চাঁদকে দেখতে পাই। আবার অস্তকালে দিগন্ত রেখা পার হয়ে যাবার পরেও স্বল্প সময়ের জন্য আমরা সূর্য ও চাঁদকে দেখতে পাই।"

মানবেতিহাসের বড় বড় আন্দোলন এবং মানুষের জীবন যাত্রার ওপর ইসলামী জীবন পদ্ধতির প্রভাব সম্পর্কে এ কয়েকটা উদাহরণই যথেষ্ট। আমরা যে সত্যকে ভুলে যাই তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করার উদ্দেশ্যেই এগুলো পরিবেশন করা হলো। আজকের সভ্যতার দিকে তাকিয়ে নিজ অজ্ঞতার কারণেই আমরা মনে করি যে এ সভ্যতায় আমাদের কোন অংশ নেই। এ সভ্যতার ওপর আমাদের কোন প্রভাব নেই এবং আমাদের চেয়ে, ইতিহা-সের চেয়ে এ সভ্যতা অনেক বড়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের ইতিহাসই তো আমাদের জানা নেই। আমাদের ইতিহাস আমরা শিখছি আমাদের দুশমনদের কাছে যারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে ইসলামী জীবনযাত্রা আর সম্ভব

নয়। তাদের বর্ণিত ইতিহাস শুনে বা পড়ে আমরা হতাশার সাগরে হাবু-ডুবু খাচ্ছি। এ হতাশা আমাদের প্রতিপক্ষকে সুযোগ দিচ্ছে। ওরা ওদের নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা হতে নিষ্কৃতি পাচ্ছে। আমাদের কি রোগ হলো যে, দুশমনরা আমাদের সামনে যে ইতিহাস বর্ণনা করছে তাই আমরা মেনে নিচ্ছি এবং তোতা পাখী বা বানরের মতো তাই পুনরাবৃত্তি করছি?

এখানে এ বিষয়টা আমাদের আলোচ্য নয়। ইসলামের সোনালী যুগ মানব-সভ্যতায় যে ছাপ রেখে গেছে তার আভাস দেয়া হলো মাত্র। মানবতা আজ এ সম্পদ-ভাণ্ডারের মূল্যায়ন করার জন্য অধিকতর সুবিধাজনক স্তরে অবস্থান করছে।

প্রভাব-পরিণতি

ইসলামের প্রথম প্রবল প্লাবন যখন শেষ হয়ে গেলো, অবতীর্ণ জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা যখন জেঁকে বসলো, শয়তান যখন পরাজিত অবস্থা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো এবং তার অনুসারীদেরকে ডাকলো (যারা ক্ষমতার বাগডোর হাতে নিতে পেরেছিল) তখনও কিন্তু মানুষের জীবন আগেকার জাহেলিয়াতের মত চরম অবস্থায় ফিরে যায়নি। পৃথিবীর বুকে আধিপত্যশীল না হলেও ইসলাম বেঁচে ছিল। সুদূর প্রসারী এক প্রভাব ইসলাম পেছনে রেখে গেলো যা মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইলো।

(ক) 'এক গোষ্ঠী'র ধারণা

আরব উপদ্বীপ গোত্র, উপ-গোত্র বা এক পরিবারের প্রতি আনুগত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। আরবের বাইরের মানুষ আনুগত্য করতো তাদের দেশ, জন্মস্থান, বর্ণ বা জাতীয়তার। এ ছাড়া অন্য কোন প্রকারের আনুগত্য হতে পারে, প্রাক-ইসলাম যুগে মানুষ তা কল্পনাই করতে পারতোনা। ইসলাম এসে ঘোষণা করলো, সব মানুষ মিলে এক জাতি। একই উৎস থেকে সব মানুষ এসেছে এবং এক আল্লার দিকেই ধাবিত হচ্ছে। জাতি, বর্ণ, জন্মভূমি, বংশ ইত্যাদি মানুষে-মানুষ বিভেদ সৃষ্টির জন্য নয়, বরং এগুলো পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সবার ওপর এবং পরিশেষে সবাইকে আল্লার কাছে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। আল্লাহ বলেন: "ওহে মানুষেরা, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে

জাতি ও গোত্রে ভাগ করেছি যেন তোমরা পরস্পরের পরিচিতি পেতে পারো। আল্লার দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাবান যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি অধিকতর ভয় পোষণকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞানী।"

"ওহে মানুষেরা, যে আল্লাহ তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে ভয় কর। অতঃপর তিনি তার একজন সংগিনী সৃষ্টি করেছেন। তারপর এ দু'জন থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে আল্লাকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে একে অপরের কাছে নিজের হক দাবী করো এবং আত্মীয়-স্বজন ও নিকটস্থের সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই জেনো আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।"—আন নিসা।

"তাঁর নিদর্শনের মধ্যে আছে আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এগুলোর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য আছে নিদর্শন।" —আর রুম।

এগুলো কেবল তাত্বিক কথা নয়, বাস্তব সত্যও। ইসলাম পৃথিবীর বিশাল অংশ জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষকে এক করতে পেরেছিল। বর্ণ, গোত্র, বংশ ইত্যাদি সেদিন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ইসলামের সোনালী যুগ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও এ ভ্রাতৃত্ববোধ পৃথিবী থেকে পুরোপুরি তাড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। অবশ্য এটা সত্য যে, ইসলামী সমাজের মত বিশ্ব-মানব এ ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ শান্তি আর কখনও অন্য কোন মতাদর্শ দ্বারা অনুভব করতে পারেনি।

ছোটখাট আনুগত্য ও গোঁড়ামী এখনো এখানে-সেখানে বিরাজ করছে। জন্মভূমি, দেশ, বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে এখনো আনুগত্য-নীতি স্থির হচ্ছে। আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্য একটা প্রকট সমস্যা। একটু আচ্ছাদিত রূপে ইউরোপেও বর্ণ-বৈষম্য বিরাজ করছে। তবুও, এক মানব জাতির ধারণাই আজকের বিশ্ব-মানুষের কাছে স্বীকৃত ব্যাপার। ইসলামের ঘোষিত এক মানব গোষ্ঠির ধারণা সব মানবতাবাদী চিন্তার মূল।

অন্যান্য ক্ষুদ্র আনুগত্য আজ অবক্ষয়ের সম্মুখীন। ইসলামের প্রথম প্রবল ঢেউ এক মানব গোষ্ঠি সম্পর্কিত বিশ্বজনীন মূল্যমান রেখে গেছে। রেখে গেছে

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার বিশাল সম্পদ। মানুষ আজ ইসলাম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উর্বর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান।

(২) মানব মর্যাদার ধারণা

ইসলাম এসে দেখলো মানবিক মর্যাদা পাচ্ছে কেবলমাত্র বিশেষ শ্রেনী ও পরিবারের লোকেরা। সাধারণ মানুষ ছিল সমাজের নোংরা আবর্জনা বলে বিবেচিত। কোন মর্যাদা তাদের ছিলনা, ছিলনা কোন মূল্য। ইসলাম ঘোষণা করলো যে প্রতিটি মানুষই মর্যাদার অধিকারী। ভাষা, বর্ণ, গোত্র ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ণিত হতে পারেনা। সব মানুষ একই সূত্রে গাঁথা, একই উৎস থেকে আসা। সকলের অধিকার সমান। আল্লাহ বলেন ঃ "আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। বহন করেছি স্থলভাগ এবং পানির উপর। বৈধ আনন্দোপকরণ দিয়ে তাদেরকে লালন-পালন করেছি এবং অনেকানেক সৃষ্টি থেকে তাদেরকে অধিক পছন্দ করেছি।"—ইসরা।

"যখন তোমার প্রভু ফিরিশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো।" "যখন আমি ফিরিশতাদের বললাম ঃ আদমকে সম্মান প্রদর্শন কর তারা তখন সম্মান প্রদর্শন করলো। করলোনা বিতাড়িত ইবলিস। সে অবিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো।"—আলবাকারা।

"এবং তিনি তোমাদের জন্য অধীন করেছেন আসমান ও পৃথিবীর সব কিছু।"

মানুষ জানতে পারলো যে সে আল্লার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান এবং তার মর্যাদা গোত্র, বর্ণ, অঞ্চল পরিবার ইত্যাদি দ্বারা সীমিত নয়। মানুষরূপে জন্ম নেয়ার কারণেই প্রতিটি মানুষ এ মর্যাদার অধিকারী।

এ নীতি বাস্তব-ভিত্তিক। মুসলিম সমাজে এটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সে সমাজ থেকে তা বিশ্ব-সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'সমাজের নোংরা-আবর্জনা' সাধারণ মানুষগুলো তাদের মর্যাদা উপলব্ধি করলো। বুঝতে শুরু করলো যে তাদেরও অধিকার আছে। শাসকদের কাজ-কর্মের হিসাব তারাও দাবী করতে পারে। তারা আরো বুঝলো যে অবমাননার কাছে তাদের মাথা নত করা উচিত নয়। শাসক শ্রেণীকে শেখানো হলো যে তাদের কোন বিশেষ অধিকার নেই। শাসিত ব্যক্তিদের কোন মানবিক অধিকার খর্ব করার এখতিয়ার এদের নেই।

এটা ছিল মানবতার নব জন্ম। মানবিক মর্যাদা এবং অধিকার ছাড়া মানুষের মূল্য কোথায়? মানুষ হবার কারণেই স্বাভাবিকভাবে সে যদি অধিকার-সমূহের মালিক না হতে পারে, তাহলে সে কিসের মানুষ?

আবু বকর (রা) একথা ঘোষণা করে তাঁর খিলাফত শুরু করেন: "আমি তোমাদের শাসক নির্বাচিত হয়েছি। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি যদি সঠিক কাজ করি, তোমরা আমার সহযোগিতা করবে। আমি যদি ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তোমরা আমাকে সংশোধন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবো, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আমি যদি তাঁদের আনুগত্য পরিহার করি, তোমরাও আমার আনুগত্য ত্যাগ করবে।"

ওমর ফারুক (রা) জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে বলেছিলেন: "ওহে জনগণ, আমি এ জন্য গভর্ণর নিযুক্ত করছিনা যে তারা তোমাদের চামড়া খুলে নেবে অথবা তোমাদের সম্পত্তি কেড়ে নেবে। আমি তাদেরকে পাঠাচ্ছি যেন তারা দীনের জ্ঞান তোমাদেরকে দেয় এবং দীনের পথে তোমাদেরকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি যদি এদের হাতে নাজেহাল হয়, সে আমার কাছে আসবে। আল্লার শপথ আমি তার প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবো।"

আমর ইবনুল আস দাঁড়িয়ে বললেন: "ওহে আমীরুল মুমিনীন, একজন অমুসলিম প্রজার প্রতি অন্যায়কারী কোন মুসলিম গভর্ণরের কাছ থেকেও কি আপনি প্রতিশোধ নেবেন?"

ওমর ফারুক (রা) জবাব দিলেন: "ওমরের জীবন যাঁর হাতে তাঁর শপথ, ঐ ব্যক্তির কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেয়া হবে। আমি যখন রসূলুল্লাকে তা নিতে দেখেছি, আমি কি করে তা না নিয়ে পারি? লোকদেরকে মারধর করোনা। এ কাজ তাদেরকে অবমানিত করবে। তাদেরকে তাদের বাড়ী ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করোনা। এটা তাদের মনে বিদ্রোহাত্মক কাজের উস্কানী দেবে। তাদের অধিকার খর্ব করোনা। এ কাজ তাদেরকে অবিশ্বাসের পথে নিয়ে যাবে।"

ওসমান (রা) সব শহরের লোকদের উদ্দেশ্যে লিখে পাঠালেন: "আমি

আমার গভর্ণদের এ কাজ করতে দেখতে চাই যে প্রতি বছর হজ্জের সময় তারা আমার সাথে দেখা করবে। আমাকে শাসনভার এ জন্য দেয়া হয়েছে যেন আমি ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারি। আমার নির্দেশের অতিরিক্ত কিছু যেন লোকদের ওপর চাপানো না হয়। আমার বা আমার গভর্ণরদের জনগণের ওপর কোন বিশেষ অধিকার নেই। মদীনায় একথা প্রচার হয়েছে যে একদল লোককে মারধর ও অবমানিত করা হয়েছে। এ দাবী যে করে তাকে হজ্জের মৌসুমে আমার কাছে আসতে বলছি এবং সে ব্যক্তির সত্যিকার অধিকার আমার কাছ থেকে অথবা আমার গভর্ণরের কাছ থেকে আদায় করে দেয়া হবে। অথবা তোমরা একে অপরকে ক্ষমা করে দাও। কেননা আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা পরস্পরকে ক্ষমা করে।"

এগুলো শুধু ঘোষণা মাত্র ছিল না। এগুলো বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল এবং আচরণের নীতিমালা রূপে দেশবাসী কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। ইবনুল কিবতীর ঘটনাটাই ধরা যাক। সে মিশরের গভর্ণর আমর-ইবনুল আসের পুত্রের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। গভর্ণর-পুত্র প্রতিযোগিতায় জিতলো এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীর গায়ে হাত তুললো। আল-কিবতী নালিশ নিয়ে হাজির হলেন ওমর (রা)-এর দরবারে। আমীরুল মুমিনীন হজ্জের মৌসুমে প্রকাশ্যে অপরাধীকে শাস্তি দিলেন। এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকেরা ওমর ফারুকের (রা) ন্যায়-বিচার সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেন। কিন্তু এ ঘটনার আরেকটা দিকও আছে। সেটা হলো মানব-মনের মুক্তির দিক।

মিশর ছিল বিজিত দেশ। সবেমাত্র ইসলামের আলো সেখানে হাজির হয়েছিল। আল কিবতী তখনো ছিল কপট সম্প্রদায়ের একজন। বিজিত দেশের একজন সাধারণ মানুষ। আমর ইবনুল আস মিশর জয় করেন এবং সে দেশের প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন। মুসলিমদের আবির্ভাবের পূর্বে সে দেশের শাসক ছিল বাইজেন্টাইনগণ। বাইজেন্টাইন শাসকদের চাবুক যখন তখন প্রজাদের পিঠে পড়তো। সম্ভবতঃ আল কিবতীর পিঠে তখনো অনুরূপ আঘাতের দাগ বর্তমান ছিল। কিন্তু ইসলামী সাম্যের কথা এই ব্যক্তি শুনেছিল এবং তার নমুনা কিছু কিছু দেখেছিল। এ অবগতি তার মানবিক চেতনাকে জাগিয়ে দিল। গভর্ণরের পুত্রের হাতে তার পুত্র অবমানিত হওয়ায় তার আত্মসম্মান

বোধ জেগে উঠলো। এ মর্যাদাবোধের জাগৃতি তাকে মিশর থেকে মদীনায় যেতে উদ্বুদ্ধ করলো। সে কালে ট্রেন, এরোপ্লেন বা মোটর যানের প্রচলন ছিলনা। উটে আরোহন করে সে এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলো। পথের দৈর্ঘ এবং কষ্ট সে উপেক্ষা করলো আমীরুল মুমিনীনের কাছে তার বেদনাহত মনের ফরিয়াদ জানাবার উদ্দেশ্যে। বাইজেন্টাইনীদের শাসনে থেকে সে তার মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। সেদিন সে নীরবে সব আঘাত সহ্য করতে পারতো। কিন্তু ইসলামের আলো মিশরে প্রজ্জ্বলিত হবার পর সে তার মর্যাদাবোধ খুঁজে পেল। ইসলাম মানবতার মুক্তির জন্য কি গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল এথেকে তার প্রমাণ মিলে। এটা ওমর ফারুকের (রা) বিচার-ব্যবস্থার ফল ছিলনা। এটা ছিল ইসলাম কর্তৃক মানব-প্রকৃতিকে মুক্তির বাণী শুনানোর পরিণতি।

মানব সমাজ আর কোনদিন ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের মত উচ্চাসনে বসতে পারেনি, এটা সত্য। কিন্তু শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সকলের মানবিক অধিকার ভোগের ইসলামী সাম্য মানব সভ্যতায় এক গভীর রেখাপাত করেছে। আংশিকভাবে হলেও সেই প্রভাবই আজকের মানুষকে মানবাধিকারের সনদ ঘোষণা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। এ ঘোষণা এখনো সার্থক হয়নি। এখনো পৃথিবীর নানা স্থানে মানুষ ঘৃণা, অবমাননা, নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। কোন কোন জীবন-দর্শন মানুষকে বড় জোর মেশিনের মর্যাদা দিচ্ছে এবং অধিকতর উৎপাদনকেই একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে মানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সম্ভাবনাকে ধ্বংস করেছে। এসব সত্ত্বেও ইসলামের দেয়া মানবিক মর্যাদার ধারণা আজো মানুষের মন ও কল্পনায় বেঁচে আছে। মানুষের মর্যাদার ধারণা মানবজাতির কাছে আজ অপরিচিত নয়। আগামী দিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সাধনা দেখে আগের মত মানুষ একে অচিন্তনীয় একটা কিছু বলে বিবেচনা করতে পারবে না।

(৩) বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ধারণা

ইসলাম এসে মানুষকে বংশ গোত্র, অঞ্চল, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভক্ত দেখতে পেয়েছিল। এ গুলো কিন্তু মানুষের আসল প্রকৃতির ওপর বড়

রকমের প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। মানুষের মহান সত্তার ওপর এ গুলো ছিল নিতান্তই নগণ্য ও সাময়িক প্রলেপ।

ইসলাম বলিষ্ঠভাবে তার নীতি ঘোষণা করলো। ইসলাম বললো ঃবংশ পরিবার, গোত্র, ভাষা, বর্ণ, আঞ্চলিকতা—এ গুলো মানুষকে একত্রিত করার বা বিচ্ছিন্ন করার প্রকৃত ভিত্তি হতে পারে না। মানুষের ঈমান, এবং আল্লার সাথে তাদের সম্পর্কই এক মানুষের সাথে আরেক মানুষের সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। আল্লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মানুষ সত্যিকারের মানুষত্ব লাভ করে। কাজেই এ সম্পর্কই তাদের একাল-সেকালের জীবন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করবে।

ঐক্যের ভিত্তি ঈমান। ঈমান মানব-সত্বায় সুন্দরতম গুণ। ঈমানের সম্পর্ক তিরোহিত হলে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ঐক্যের অস্তিত্বই আর থাকেনা। এ মহান গুণটির ভিত্তিতেই মনবতার ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

সারা পৃথিবী জুড়ে দু'টো দল। একটি আল্লার। অপরটি শয়তানের। আল্লার দল তাঁর পতাকাতলে তাঁর প্রতীক বহন করে একত্রিত হয়। যারা আল্লার পতাকাতলে একত্রিত হয় না, তারা সবাই শয়তানের দলের সদস্য। 'উম্মা' বা মুসলিম মিল্লাত ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ একটি সম্প্রদায়। ঈমান নেই তো উম্মা নেই। বর্ণ, গোষ্ঠি, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদি উম্মা সৃষ্টি করতে পারে না।

ঐক্য সৃষ্টিকারী বন্ধন তো এমন হওয়া চাই যা মানুষের মনকে আপ্লুত করবে। এটা এমন ধারণার জন্ম দেবে যা জীবন ও জগতকে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। এটা এমন বিষয় হবে যা মানুষকে আল্লার সাথে যুক্ত করবে এবং মানুষকে অপরাপর জন্তু-জানোয়ার হতে পৃথক মর্যাদা দান করবে। আল্লাহ বলেন ঃ ''তোমরা এক সম্প্রদায়। আমি তোমাদের প্রভু। আমার ইবাদাত করো।"—আল আম্বিয়া।

"তুমি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যারা আল্লাহ ও রসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে যদিও তারা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা ভ্রাতা কিংবা তাদের আত্মীয়-স্বজন হয়। এদের অন্তরে তিনি ঈমান দিয়েছেন এবং তিনি নিজ হতে আত্মা দান করে তাদেরকে শক্তিসম্পন্ন করেছেন। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার

নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারা সন্তুষ্ট আল্লার প্রতি। এরা আল্লার দল। নিশ্চয়ই আল্লার দল কল্যাণের অধিকারী।"—আল মুজাদিলা।

মানুষকে হত্যা করা বৈধ জিহাদের ময়দানে। আল্লাহ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন: "যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লার পথে লড়াই করে। যারা কুফরী অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত আসলে অত্যন্ত দুর্বল।"—আন নিসা।

ঈমানের ভিত্তিতে ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াসকে মানুষ আগে আজগুবী একটা কিছু মনে করতো। কিন্তু এ যুগের গতিধারা লক্ষ্যণীয়। কয়েকটা দেশ, কয়েক ভাষা-ভাষী জাতি এবং কয়েক বর্ণের ও গোষ্ঠীর লোকদের একত্রিত করে মতবাদের ভিত্তিতে জাতি গঠন করতে দেখা যায় এ যুগে। তারা আল্লার প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে একত্রিত হচ্ছে না। তারা এটা করছে অর্থনৈতিক বা সামাজিক মূল্যায়নের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে। আর এটা স্বীকৃত হচ্ছে যে ঐক্যের সূত্র একটা আত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধন বা ঈমানই হতে পারে। নিঃসন্দেহে এটা একটা অগ্রগতি।

মানুষের উচিত মহান ও উন্নত কোন কিছুর প্রতি নজর দেয়া। ইসলামের আগামী জোয়ারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা। এমতাবস্থায় সে তার পুঁজি হিসাবে পাবে নতুন-পুরাতন অভিজ্ঞতার মূল্যবান সম্পদ। তার সাথে পাবে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক সাড়া।

ইসলাম যখন ঈমানের ভিত্তিতে মানুষকে একত্রিত করছিল এবং ঈমানকে ঐক্য ও অনৈক্যের মানদণ্ড স্থির করছিল, তখন সে এটাকে দুশমনীর ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেনি। অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্ক নির্ণয়কালে ইসলাম কোনদিন অসহিষ্ণুতাকে প্রাধান্য দেয় নি। আল্লাহ মুসলিমকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য এ জন্য নয় যে মুসলিমগণ জোর করে অন্যদেরকে ইসলামের অধীন করবে। বরং এ জন্য যেন ইসলাম তার পবিত্র, ন্যায়-সঙ্গত ও মহান ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ ব্যবস্থার নিরাপত্তায় থেকে যে কোন লোক যে কোন বিশ্বাস অবলম্বন করতে পারে। এ ব্যবস্থা মুসলিম-অমুসলিম

সবার প্রতিই ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করে। "দ্বীন (গ্রহণ)-এর ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক রূপে বিরাজ করছে। যে ব্যক্তি খোদাদ্রোহী শক্তিকে অবিশ্বাস করে আল্লার প্রতি ঈমান আনলো সে ব্যক্তি এক মজবুত রশি ধারণ করলো যা কোন অবস্থা-তেই ছিঁড়ে যায় না। আল্লাহ সব শুনেন, সব জানেন।"—আল বাকারা।

ইসলামী বিধান ও আইন দ্বারা শাসিত দেশকে বলা হয় দারুল ইসলাম। তার সব অধিবাসী মুসলিম না হলেও এ নামেই তাকে আখ্যায়িত করা হয়। যে দেশ ইসলামী বিধান ও আইন দ্বারা শাসিত নয় তাকে বলা হয় দারুল হারব্। দারুল ইসলাম এবং দারুল হারবের সম্পর্কের ব্যাপারেও ইসলাম নীরব নয়। দারুল ইসলাম যদি দারুল হারবের সাথে কোন চুক্তি বা সন্ধিতে আবদ্ধ হয় তা অবশ্যই পালন করতে হবে। প্রতারণা-প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। চুক্তির মেয়াদ স্বাভাবিকভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা অপর পক্ষ কর্তৃক ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্পর্ক থাকবে। কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ ছাড়াই যদি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়, তবে তার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। বিপক্ষের দিক থেকে প্রতারণার আশঙ্কা দেখা দিলে তা বাতিল করা যাবে। চুক্তি বাতিলের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে।

লড়াইয়ের জন্য ইসলাম নির্দিষ্ট বিধি-বিধান রেখেছে। যদি শত্রুপক্ষ শান্তি চায়, যদি জিজিয়া দিয়ে ইসলামী সমাজে নিরাপত্তার অধীনে আসতে চায় তাহলে তাকে ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস সত্বেও নিরাপত্তা ভোগের অধিকার দিতে হবে।

"নিশ্চয়ই আল্লার কাছে পৃথিবীতে বিচরণশীল জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে নিকৃষ্টতম সে সব লোক যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। কোন প্রকারেই তা কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি। তাদের মধ্যে ওই লোকেরা অধিকতর নিকৃষ্ট যাদের সাথে তুমি সন্ধি-চুক্তি করেছো, অথচ তারা প্রত্যেকটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং খোদাকে একটুও ভয় করে না। এ লোক-গুলোকে যদি যুদ্ধের ময়দানে পাও তাহলে এমনভাবে খবর নিবে যেন অপরা-পর লোকদের চেতনা জাগ্রত হয়। আশা করা যায় ওয়াদা ভঙ্গকারীদের এ পরিণতি দেখে ওরা শিক্ষা গ্রহণ করবে। আর যদি কখনো কোন জাতির

পক্ষ হতে তোমরা ওয়াদা ভঙ্গের আশঙ্কা কর, তবে তাদের ওয়াদা চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে তাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করো। আল্লাহ নিশ্চয়ই ওয়াদা ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না। সত্যবিরোধী লোকেরা যেন এ ভুল ধারণা না করে যে তারা ময়দান দখল করে নিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। আর তোমরা যতদূর বেশী সম্ভব শক্তিশালী ও সদা-সজ্জিত ঘোড়া তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রাখ যেন এর সাহায্যে আল্লাহর ও তোমাদের জানা না-জানা দুশমনদের ভীত-শঙ্কিত করতে পারো। আল্লাহ এদের জানেন। আল্লার পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কখনো জুলুম করা হবে না। আর হে নবী, শত্রু যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয়, তবে তুমিও এর জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লার ওপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।"—আল্ আনফাল।

আল্লাহ যে কোন মূল্যে সন্ধি-চুক্তি সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। "তোমরা আল্লার ওয়াদা পূরণ করো যখন তাঁর নিকট কোন ওয়াদা শক্তভাবে বেঁধে নিয়েছ এবং তোমাদের অংগিকার পাকা পোখত করে নেবার পর তা ভংগ করো না যখন তোমরা আল্লাকে সাক্ষী বানিয়েছো। আল্লাহ তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমাদের অবস্থা যেন সে মহিলার মত না হয় যে খেটে-খুটে সুতা কেটেছে এবং পরে তা নিজেই ছিড়ে ফেলেছে। তোমরা নিজেদের অংগিকার গুলোকে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধোকা ও প্রতারণার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করো না, এ উদ্দেশ্যে যে একদল অপর দল হতে বেশী ফায়দা হাসিল করবে। আল্লাহ এ ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করছেন এবং বিচার দিনে তিনি তোমাদের পারস্পরিক বিরোধের মূল তত্ব প্রকাশ করে দেবেন।"

—আন নাহল।

যুদ্ধকালে কারো ইজ্জত নষ্ট করা যাবে না। শিশু, নারী ও বৃদ্ধকে হত্যা করা যাবে না। ফসল পোড়ানো যাবেনা। পশুপাল ধ্বংস করা যাবে না। মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারীদেরকেই কেবল আক্রমণ করা যাবে। আবু বকর (রা) সেনাপতি উসামা (রা)-এর সৈন্য বাহিনীর উদ্দেশ্যে উপদেশ স্বরূপ

বলেছিলেন : "বিশ্বাসঘাতকতা করো না। সীমা লংঘন করোনা। প্রতিশোধ নিয়োনা। শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের হত্যা করোনা। খেজুর ও অন্যান্য ফলের গাছ নষ্ট করোনা। খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া উট জবাই করোনা।"

এখানে আমি দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের, মুসলিম ও অমুসলিমের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছিনে। বিরুদ্ধ পক্ষগুলোর মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইসলামের মৌল নীতিগুলোই শুধু দেখাতে চেয়েছি। প্রাক-ইসলাম যুগে বিরোধী শক্তিগুলো তলোয়ার আর অসহিষ্ণুতা দিয়ে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতো। সব অধিকার কুক্ষিগত ছিল শক্তিমান পক্ষের হাতে। দুর্বল পক্ষের কোন অধিকার ছিল না। ইসলাম এলো সুমহান নীতিমালা নিয়ে। ইসলামের মৌল নীতিগুলো আজকের পৃথিবী থেকে একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। সপ্তদশ শতক থেকে এ নীতিগুলোর আলোকে বিভিন্ন জাতি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করে। পৃথিবী আন্তর্জাতিক আইনের দিকে পা বাড়ালো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনে অগ্রসর হলো। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে এগুলো মজবুত হলো। এ সব সংস্থা ব্যর্থতা ও সফলতার বন্ধুর পথে এগিয়ে আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক ও সহযোগিতা কায়েম করতে গিয়ে আজকের মানুষ অবশ্য ইসলামের সোনালী যুগের মানুষের মত উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করছে না। পাশ্চাত্য আইন শাস্ত্রের নির্দেশিত আন্তর্জাতিক আইনও বিভিন্ন সময়ে মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। যুদ্ধ ঘোষণা ও চুক্তি ভংগের অবৈধতার নীতি পদদলিত হয়েছে। মরুভূমির জন্তুদের চেয়ে মানব সমাজেই অতর্কিত হামলা ও হত্যা বেশী প্রচলিত হয়েছে। যুদ্ধের কারণ হিসাবে কাজ করছে সুবিধাবাদ, লুন্ঠন-স্পৃহা, গনিমতের মাল লাভের আশা, নতুন বাজার লাভ ইত্যাদি। ইসলামী জিহাদ পরিচালিত হতো ঈমানের জন্য—পুণ্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য। আজকের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীতেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণা এখনো রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের প্রথম সার্থক রূপায়ন করেছিল ইসলাম—বিশ্ব বিধাতা কর্তৃক অবতীর্ণ মহান ও বাস্তব জীবন বিধান। মানুষকে যদি আবার এ পথে ডাকা হয়, এ মুহূর্তেও

মানুষের কাছে অচেনা ঠেকবে না। এর নৈতিক বুনিয়াদ হয়তো মানুষের কাছে অভিনব অনুমিত হতে পারে। কেননা মানুষ তো এখন জাহেলিয়াতের পংকে নিমজ্জিত। কিন্তু এ মূল্যমান মানুষের কাছে একেবারে অজ্ঞাত নয়।

ইসলাম প্রাথমিক যুগে কেবল মাত্র মানব-প্রাকৃতির ওপর নির্ভর করেছিল। আগামী দিনের ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মানুষকে তার অনেক মূল্যমানের সাথে পরিচিত পাবে। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতাও এ আন্দোলনের সহায়ক হবে। আগামী দিনের আন্দোলন তাই নব অগ্রাভিযানে অধিকতর সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ।

পরিশেষে

এ আলোচনায় এর চেয়ে বেশী বিস্তারিতভাবে ইসলামের ওসব ধ্যান-ধারণা ও নিদর্শন সম্পর্কে বলা সম্ভব নয় যেগুলো বিগত শতাব্দীর ইতিহাস এবং বর্তমান সভ্যতায় বিকৃত বা আংশিকভাবে হলেও বিরাজমান। যে কয়টা উদাহরণ পেশ করা হলো সেগুলো অসংখ্য প্রভাব ও নিদর্শনের মাত্র কয়েকটা। চৌদ্দ শ' বছরের ইতিহাসে সেগুলো ছড়িয়ে আছে।

একটা চূড়ান্ত কথা এখানে বলা দরকার। বলা দরকার তাদের জন্য যারা আল্লার পথে লোকদেরকে আহ্বান করেন। বলা দরকার এজন্য যেন অনুকূল ও সহায়ক উপকরণাদি দেখে তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে না যায়। এবং যেন তাঁরা চলার পথের প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে ভুলে না যান।

এ শেষ কথাটা তাই প্রতিকূল বিষয়গুলো সম্পর্কে—যে বিষয়গুলো চলার পথে বড় রকমের বাধা হয়ে আছে। সামগ্রিক ভাবে মানব জাতি আজ আল্লাহ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অতীতে কোন কালে মানুষ আল্লাহ থেকে এত বেশী দূরে ছিলো না। মানব-প্রকৃতি আজ কাল মেঘের আড়ালে লুক্কায়িত। এ কাল মেঘ খুব গাঢ় ও ঘন। প্রাক-ইসলাম যুগের জাহেলিয়াত সাধারণ অজ্ঞতা এবং আদিম সারল্য-মিশ্রিত ছিল। আজকের জাহেলিয়াত জ্ঞান-বিজ্ঞান, জটিলতা ও তাচ্ছিল্য ভাবের সাথে জড়িত।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে। গীর্জা এবং গীর্জার প্রভু—যার নামে জ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের

পোড়ানো হতো বা হত্যা করা হতো—থেকে মানুষ সেদিন পালাতে শুরু করলো। সে পলায়ন ছিল ভীতি ও উন্মত্ততা সহকারে পলায়ন। সে পলায়ন আর কিছুতেই থামলো না। এটা অবশ্য সত্য যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কার ও উপলব্ধি বিজ্ঞানীদেরকে আবার আল্লার পথে পরিচালিত করতে শুরু করেছে। কিন্তু চোখ-ধাঁধানো অবস্থা এখনো মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। পথহারা মানুষের বিরাট দলটি সঠিক পথে ফিরে আসার পূর্বেই এ শতাব্দীর বাকী অংশটুকু শেষ হয়ে যাবে।

পার্থিব জীবনে ভোগের পরিধি বেড়ে গেছে। তা যেন আজ মানুষের অস্তিত্ব এবং অনুভূতিকেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বর্তমান সভ্যতার আরাম ও বিলাসোপকরণ মানুষকে ঘিরে ফেলেছে। মানুষ পার্থিব জীবনের ভার ও বিশালত্ব অনুভব করতে শুরু করেছে। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা মানব-জীবন ও অনুভূতিতে নতুন দিগন্ত সংযোজন করেছে।

এ সব কিছু যদি আল্লার জ্ঞান, আল্লার গুণাবলীর পরিচিতি, আল্লার সাথে সম্পর্কিত মানুষের গুণাবলী, মানুষ আল্লার প্রতিনিধি—এ বিশ্বাস, মানুষের জন্য আল্লাহ পৃথিবীর উপায় উপকরণ অধীন করে দিয়েছেন—এ ধারণা, আল্লাহ প্রয়োজনীয় মেধা-যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন—এ বিশ্বাস, এবং এ পৃথিবীর জীবনে মানুষ পরকালের জন্য পরীক্ষিত হচ্ছে মাত্র—এ ধারণার ওপর গড়ে ওঠতো তাহলে তো মানুষ আল্লাব ও তাঁর পথ তথা ইসলামের অতি নিকটবর্তী হতে পারতো। কিন্তু এ সব কিছু আত্ম-প্রকাশ করলো স্বৈরাচারী গীর্জা ও তার প্রভু থেকে দূরে পালিয়ে যাবার প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করে। কাজেই এ নতুন সংযোজন আল্লাহ ও মানুষের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টির সহায়ক হলো এবং তা হলো তাঁর পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। আল্লার পথে যাঁরা মানুষকে ডাকেন তাঁদেরকে অবশ্যই এ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

এটা স্বীকৃত যে মানব জাতি আজ অসহায় এবং বস্তুবাদী সভ্যতা ও বিলাসিতার বোঝা বহন করে ক্লান্ত। এটা সত্য যে দুর্নীতি, স্নায়বিক ও মানসিক ব্যাধি এবং বুদ্ধি বৃত্তিক ও যৌনবিকৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার অংগ খেয়ে ফেলছে, ব্যক্তি ও জাতিকে ধ্বংস করছে আর জোর করেই লোকদের চোখ ঘুলিয়ে দিচ্ছে। তথাপিও মানুষ তাদের পাশবিক উত্তেজনা, উন্মাদনা,

হৈ হুল্লোড় ও বিশৃঙ্খলার মাঝেই থাকতে চাচ্ছে। তাদের চোখ পুরোপুরি খুলে যাবার আগে, তাদের মস্তিষ্ক থেকে নেশাগ্রস্ততা ও তন্দ্রাভাব পূর্ণভাবে তিরোহিত হবার আগেই এ শতাব্দী গা ঢাকা দেবে।

দূর অতীতের জাহেলিয়াত যাযাবর জীবনের আদিমতার সাথে যুক্ত ছিল। যাযাবর জীবনের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি তাদের আচরণকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ গুলো জাহেলিয়াতের অনুসারী এবং ইসলামের পথে আহ্বানকারীদের মধ্যকার সংঘর্ষকে ভয়াবহ করে তুলেছিল। কিন্তু সে সংঘর্ষটা ছিল প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট। মানব-প্রকৃতি তাই সহজে সাড়া দিতে পেরেছিল। ঈমান ও কুফর সে দিন স্পষ্টভাবে বিবৃত ছিল। আজকের দিনে মানুষ সব ধর্ম বিশ্বাসও মতবাদের প্রতি উদাসীনতা, তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শন করছে। মানুষ আজ সারল্যের পরিবর্তে মুনাফেকী, প্রতারণা ও নীচু মনোভাব অবলম্বন করছে। এগুলো যাঁরা আল্লার পথে লোকদের ডাকেন তাঁদের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা হিসাবে অবস্থান করছে।

এসব প্রতিবন্ধকতা উৎড়িয়ে যাবার জন্য তারা নিজেদেরকে কিভাবে সজ্জিত করবেন, এটা একটা বড় প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের করণীয় তাকওয়া অবলম্বন। আল্লাহ্ সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন। আল্লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন। আর আল্লার এ ওয়াদার ওপর বিশ্বাস স্থাপনঃ "মুমিনদেরকে বিজয় দান করা আমার কর্তব্য।"

এক দল ঈমানদারকে এগিয়ে আসতে হবে আল্লার দ্বীনের সাথে নিজেদেরকে পরিপূর্ণরূপে যুক্ত করার জন্য। আল্লার ওয়াদার প্রতি তাদের থাকবে অবিচল আস্থা। আর তাদের জীবনের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য হবে আল্লার সন্তোষ অর্জন। এ দলটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর নিয়ম প্রয়োগ করবেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় মানব-প্রকৃতি কালো মেঘের আড়াল থেকে মুক্ত হবে। তাঁরা আল্লার বাণী পৃথিবীতে বুলন্দ করবেন। পৃথিবীর বুকে ইসলাম প্রাধান্য লাভ করুক আল্লার এ ইচ্ছার সার্থক বাস্তবায়ন করবেন।

"তোমাদের পূর্বে বহু যুগ অতীত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখ আল্লার আদেশ ও বিধান অমান্যকারীদের পরিণতি কি হয়েছে। বস্তুতঃ এটা লোকদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ক বাণী এবং আল্লাকে যারা ভয় করে

তাদের জন্য পথ নির্দেশ ও উপদেশ। মন-ভাংগা হয়ো না, চিন্তা করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা ঈমানদার হও। এখন যদি তোমাদের ওপর কোন আঘাত এসে থাকে, তবে ইতিপূর্বে বিরুদ্ধবাদীদের ওপরও অনুরূপ আঘাতই এসেছে। এ তো কালের উত্থান ও পতন মাত্র—যা আমি লোকদের মধ্যে আবর্তিত করতে থাকি। তোমাদের ওপর এ সময় এ জন্যই এসেছে যে আল্লাহ দেখতে চান তোমাদের মধ্যে সত্যিকার ঈমানদার কে? এবং যারা প্রকৃত সত্যের সাক্ষী তাদেরকে তিনি আলাদা করে নিতে চান। কেননা জালেমদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। এ পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি খাঁটি মুমিনদেরকে আলাদা করে দিয়ে কাফেরদের মস্তক চূর্ণ করতে চান।"

—আলে ইমরান।

সমাপ্ত